বিবেকানন্দের কথা ও গল্প

বিবেকানন্দের কথা ও গল্প

(১ম ভাগ)

স্বামী প্রেমঘনানন্দ

সপ্তম সংস্করণ

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ

দেওঘর (সাঁওতাল পরগনা)

দাম

চৌদ্দ আনা

প্রকাশক—
স্বামী জ্যোতিরূপানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
দেওঘর

শিল্পী—
ত্রিভঙ্গ রায়
হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী

প্রাপ্তিস্থান—
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

১২-১-৪৬

মুদ্রাকর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৭বি গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা
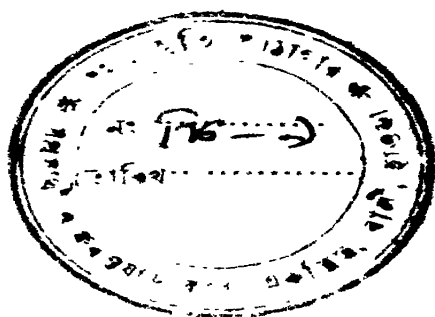
Approved by the Director of Public Instructions, Bengal, for use as Prize and Library book in Primary and Middle Schools and in Class III—VI of High English Schools and for Juvenile reading in Secondary Schools vide Calcutta Gazette dated the 29th July, 1937.
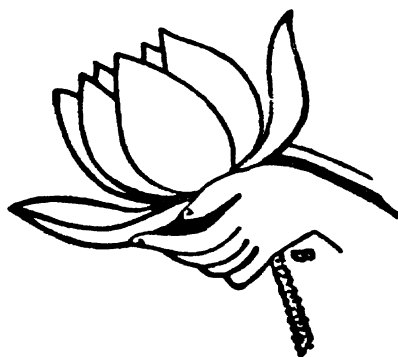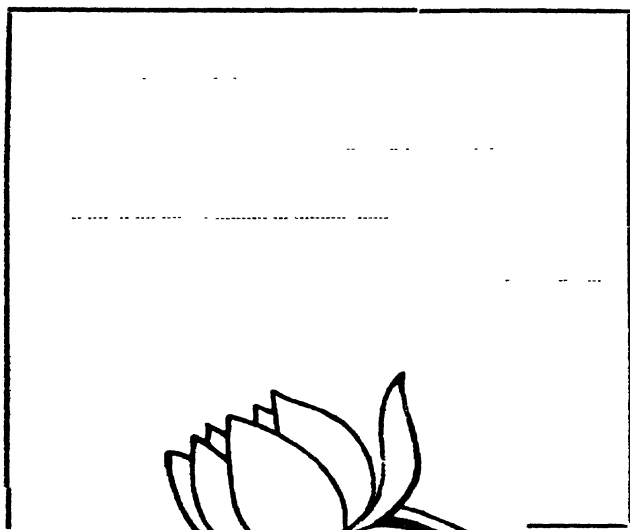
বাঙলার জল মাটিতে যে শতদল একদিন ফুটেছিল, তার সৌরভে আজ সারা বিশ্ব আমোদিত হয়ে উঠেছে। বাঙলার ছেলে বিবেকানন্দের কথা আজ সমস্ত পৃথিবীর মহা মহা গুণীরা পাঠ করে আনন্দ লাভ করেছেন।

বিবেকানন্দের জীবনের দুএকটি কথা এবং উপদেশ-ছলে তিনি যেসব গল্প বলেছিলেন, তার কয়েকটি একত্র করে বাঙলার ছেলেমেয়েদের হাতে দিলুম।

অধিকাংশ গল্পই তিনি অতি সংক্ষেপে বলে গেছেন। সেগুলো ছোটদের উপযোগী করবার জন্য অনেকখানি বাড়িয়ে লেখা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিক উৎসব দিবস

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর

আশ্বিন, শুক্লা একাদশী, ১৩৪৪

সূচীপত্র

রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি

স্বামী বিবেকানন্দ

বর্তমান যুগের মহাতীর্থ দক্ষিণেশ্বর। সেখানে পঞ্চাশ বৎসর আগে মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ বাস করতেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরের পাষাণ প্রতিমায় সাধনার বলে রামকৃষ্ণ প্রাণ এনেছিলেন। দেবতা তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন, সব বিষয়ে তাঁকে উপদেশ দিতেন।

মার আদুরে ছেলে রামকৃষ্ণ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে বৎসরের পর বৎসর যে কঠোর ধর্মসাধনা করেছিলেন এবং তাতে যে-ভাবে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। রামকৃষ্ণ বাংলার ক্ষুদ্র একটি পল্লীগ্রামের এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান।

কিন্তু সাধনার গুণে বিশ্বের মা যেদিন তাঁর মাথায় ধর্মের মুকুট পরিয়ে দিলেন, সেদিন তিনি এক অতুল ধনসম্পদের অধিকার লাভ করেছিলেন। এ ধনসম্পদ—টাকা পয়সা নয়, মণি, মুক্তা, হীরা, জহরৎ নয়, সাত রাজার ধন মানিক নয়, তার চেয়েও বড়, তার চেয়েও দুর্লভ—আধ্যাত্মিক সম্পদ, আত্মিক জ্ঞান।

ফুল ফুটলে মৌমাছি আপনি আসে। রামকৃষ্ণের হৃদয়-কমল যেদিন ফুটল, মধুলোভে ভ্রমরের দল চারদিক থেকে দলে দলে সেদিন ছুটে এসেছিল। রামকৃষ্ণ যখন মার দেখা পেলেন এবং তারপর একে একে বহু মতে বহু ধর্মে বহু সাধনায় সাধন করে সিদ্ধি লাভ করলেন তখন দেশ বিদেশের কত ধর্মপ্রাণ নরনারী তাঁর কাছে ছুটে এসেছিলেন—প্রাণে শান্তি পাবার জন্য, অন্ধকারে আলো পাবার জন্য। রামকৃষ্ণ তাঁর ধনভাণ্ডার অকাতরে তাঁদের সামনে খুলে দিলেন—নিয়ে যাও যে পার যত। যাঁরা গিয়াছিলেন, অন্তরে তাঁরা শান্তি পেলেন, স্বর্গের আনন্দ লাভ করলেন।

রামকৃষ্ণের মনে তখন এক নূতন ভাবনার উদয় হল, তাঁর শরীর যাবার পর, তাঁর এ অতুল সম্পত্তির অধিকারী হবে কে? যত দিন যায়, রামকৃষ্ণ তত ব্যাকুল হন, পথ পানে চেয়ে থাকেন। তাঁর ধনভাণ্ডারের উত্তরাধিকার লাভ করবার জন্য কে আসবে? অল্পদিন পর সিমলার দত্ত পরিবারের ছেলে নরেন্দ্রনাথ একদিন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, তুমি ঈশ্বরকে দেখেছ?

রামকৃষ্ণ উত্তর করলেন, হাঁ, আমি ঈশ্বরকে দেখেছি। "শুধু দেখেছি নয়, তোমাকেও দেখাতে পারি।"

নরেন্দ্র বহু ধার্মিক লোকের কাছে গিয়েছেন, সকলকেই ঐ প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু একজনও বলতে পারেন নি, তিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। রামকৃষ্ণ বললেন—তিনি দেখেছেন। শুধু দেখেছেন নয়, দেখাতেও পারেন। নরেন্দ্রনাথ একেবারে অবাক হয়ে গেলেন।

নরেন্দ্রনাথকে দেখেই রামকৃষ্ণদেব বুঝতে পারলেন, যার জন্য তিনি ব্যাকুল ভাবে অপেক্ষা করছেন, যার জন্য তিনি রাতদিন পথপানে চেয়ে আছেন, এ সেই মানুষ। নরেন্দ্রনাথও বহুদিন ধরে রামকৃষ্ণকে নানাভাবে পরীক্ষা করলেন, তারপর তাঁর চরণে নিজেকে চিরদিনের মত বিকিয়ে দিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

রামকৃষ্ণ তখন পরম যত্নে নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। সমাধি অতি উচ্চ অবস্থা। বহু সাধনায় মানুষ সমাধি লাভ করতে পারে। সমাধিতে ঈশ্বর দর্শন হয়। সমাধির অবস্থায় মানুষ এক দিব্য আনন্দ উপভোগ করে। পৃথিবীতে যত প্রকার আনন্দ আছে, সকলকে একত্র করলেও সে আনন্দের সঙ্গে তুলনা হয় না। রামকৃষ্ণের শিক্ষায় নরেন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই ঈশ্বর দর্শন করে ধন্য হয়েছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভাল বাসতেন। একদিন রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি চাস্?

উত্তরে নরেন্দ্র বললেন, আমাকে এমন করে দাও, যেন দিবানিশি সমাধিতে ডুবে থাকি। সংসারের কোন জ্ঞান যেন আমার না থাকে।

এ কথায় রামকৃষ্ণ তাঁকে ভৎ´সনা করে বলেছিলেন, ছি! আমি মনে করেছিলুম, তুই বিশাল অশ্বত্থ গাছের মত হবি, আর জগতের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তাপিত প্রাণী তোর ছায়ায় এসে আশ্রয় পাবে, শান্তি লাভ করবে। তুইও কিনা শেষ কালে কেবল নিজের আনন্দের জন্য পাগল হলি!

রামকৃষ্ণের কথায় নরেন্দ্রনাথ সেদিন যে লজ্জা পেয়েছিলেন, এমনটি তাঁর সারা জীবনে আর কখনও তিনি পান নি।

যাঁরা পাথরের মূর্তি তৈরী করেন, তাদের নাম ভাস্কর। সুদক্ষ ভাস্কর একখণ্ড উত্তম পাথর নিয়ে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাতে দেবতার রূপ দান করেন। যাঁরা বিখ্যাত চিত্রকর তাঁরা তাঁদের অন্তরে এক মানস প্রতিমার রূপ দর্শন করেন। তারপর তুলিকায় বহু পরিশ্রমে কাগজের উপর তাঁর মানস দেবতার রূপ ফুটিয়ে তোলেন। রামকৃষ্ণও ঠিক তেমনি যুবক নরেন্দ্রকে তিলে তিলে পলে পলে স্বামী বিবেকানন্দরূপে গড়ে তুলেছিলেন,—তাঁর সীমাহীন আধ্যাত্মিক ধন-ভাণ্ডারের উপযুক্ত অধিকারী হবেন বলে, সারা জগতে তাঁর ধনরাশি আপামরে বিলিয়ে দেবেন বলে।

সংসারের দুঃখ কষ্ট মানুষের যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন মানুষ ভগবানকে খোঁজে। তাদের কেউ কেউ কঠোর তপস্যা

করে ভগবানের দেখা পায়। ঈশ্বর দর্শনের যে আনন্দ তার আস্বাদ একবার পেলে মানুষের মন আর সংসারের কারু কথা ভাবে না। সে আনন্দেই চিরদিনের মত ডুবে যায়। কিন্তু এমন দুএকজন মহাপ্রাণ মানব দেখা যায়, যাঁরা সে দিব্য আনন্দের আস্বাদ লাভ করেও তাতে একেবারে ডুবে যান না। সেই অমৃতধারা মাথায় করে নিয়ে আসেন সংসারের বেদনা-পীড়িত নরনারীর জন্য। তাঁরাই মানবসমাজের মহাপুরুষ, তাঁরাই যথার্থ মানব-দেবতা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেহত্যাগ করলেন। যে সকল যুবক তাঁর কাছে আসতেন তাঁদের অনেকেই সংসার ত্যাগ করে বিবেকানন্দের সঙ্গে সন্ন্যাসী হলেন। বিবেকানন্দ তখন কিছুকাল তপস্যায় ও শাস্ত্রপাঠে মন ডুবিয়ে দিলেন। তারপর দণ্ড কমণ্ডলু হাতে পরিব্রাজক বেশে ভারতের তীর্থে তীর্থে, দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করলেন। তাঁর সে সময়ের কঠোর তপস্যার কথা বলে শেষ করা যায় না। একটি পয়সাও সম্বল না নিয়ে কত বিপদের ভিতর দিয়ে তিনি সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, সে কাহিনী অতি আশ্চর্য।

হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত ভ্রমণ শেষ করে কন্যা-কুমারীতে এক সন্ধ্যায় ভারতের শেষ পাথরখানার উপর তিনি যখন বসেছিলেন, সারা ভারতের দুঃখ দৈন্য অভাব অনাহার অজ্ঞান-অন্ধকার যেন মূর্তি ধরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। ভারতভ্রমণের কালে ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে দুঃখের দারিদ্র্যের যে করাল ছবি তিনি দেখেছিলেন, সে-সব এক সঙ্গে তাঁর হৃদয়ে

এসে আঘাত করতে লাগল। কেঁদে কেঁদে তিনি প্রার্থনা করলেন, জাগো মা, জাগো মা, ভারতের দুঃখ দারিদ্র্য দূর কর মা।

ঠিক সে সময় এমেরিকার শিকাগো শহরে এক মহামেলা বসেছিল। তাতে এক বিশ্ব-ধর্মসভার অধিবেশন হয়। সমস্ত পৃথিবীর বড় বড় সকল ধর্মকে তাতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এ সভার আয়োজন করেছিলেন রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টানেরা। তাঁদের মতলব ছিল, জগতের সকল ধর্মের লোককে ডেকে দেখাবেন, রোমান ক্যাথলিক ধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং তারপর খুব জোরে তাঁদের ধর্ম সারা পৃথিবীতে প্রচার করবেন। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম এবং আরো অনেক ধর্ম নিমন্ত্রণ পেয়েছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মকে তাঁরা নিমন্ত্রণ করলেন না। কারণ তখন পর্যন্ত সে-সব দেশের লোকেরা হিন্দুধর্মকে অসভ্য ধর্ম বলে মনে করত।

মাদ্রাজের কয়েকজন যুবক স্বামিজীকে দেখে বুঝতে পারলে, ইনি সাধারণ মানুষের মত নন, যেন ভস্মে ঢাকা আগুন। তারা তাঁকে এমেরিকা যাবার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করতে লাগল। শেষকালে স্বামিজী যেতে রাজী হলেন। যুবকেরা সকলে চাঁদা তুলে তাঁর যাবার ব্যবস্থা করে দিলে।

তাঁর গুরুদেবের নাম স্মরণ করে স্বামিজী সাগর পাড়ি দিলেন। সেখানে গিয়ে তাঁকে অনেক বিপদে পড়তে হয়েছিল। ইউরোপ এমেরিকার সাদা লোকেরা পৃথিবীর কালো লোককে কি-ভাবে ঘৃণা করে, তা সে-সব দেশে না গেলে
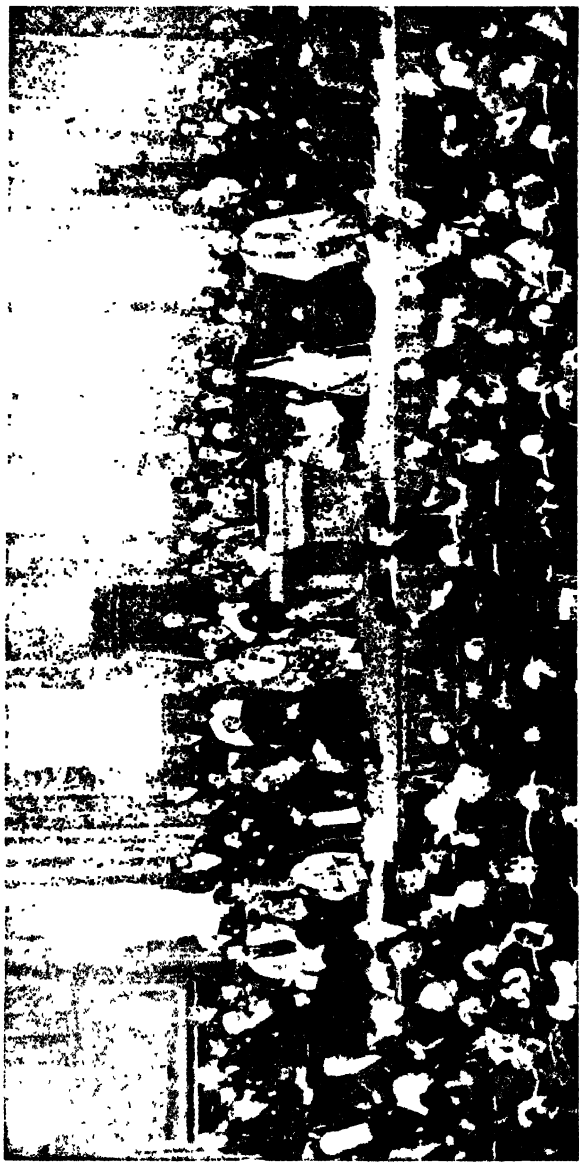
শিকাগোয় ধর্মমহাসভা

ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। স্বামিজী জানতে পারলেন, যারা ধর্মসভার নিমন্ত্রণ পায় নি, তারা সভায় যেতে বা কিছু বলতে পারবে না। একদিন হঠাৎ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট সাহেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। স্বামিজীর সঙ্গে রাইট মাত্র কয়েক ঘণ্টা আলাপ করে এত আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, তিনিই উৎসাহ করে তাঁর ধর্মমহাসভায় যাবার সকল ব্যবস্থা করে দিলেন। স্বামিজীর জন্য রাইট সাহেব ধর্মসভার সভাপতির নিকট যে পত্র দিয়েছিলেন, তাতে লেখা ছিল, এ মানুষটির মাঝে যে বিদ্যা দেখছি, আমাদের দেশের সকল পণ্ডিতকে একত্র করলেও তার সমান হবে না। (হিয়ার ইজ এ ম্যান হু ইজ মোর লার্নেড দ্যান অল আওয়ার লারনেড্ মেন পুট্ টুগেদার।)

ধর্মমহাসভার কাজ আরম্ভ হ'ল। মঞ্চের উপর পৃথিবীর সকল বড় বড় ধর্মের বক্তারা বসেছিলেন আর তাঁদের সামনে বসেছিলেন এমেরিকার বাছা বাছা শিক্ষিত পাঁচ ছ হাজার নরনারী। বক্তারা সকলেই বক্তৃতা করলেন। বক্তৃতা করতে দাঁড়িয়ে শ্রোতৃগণকে সম্বোধন করে সকলেই বললেন, হে এমেরিকার ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ।

সকলের শেষে বক্তৃতা করতে উঠলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি উঠে বললেন, হে এমেরিকাবাসী ভগ্নি ও ভ্রাতাগণ। (সিস্টারস্ অ্যাণ্ড ব্রাদারস্ অব এমেরিকা।)

এই কথা কটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তুমুল করতালি-ধ্বনি হতে লাগল। সে আনন্দধ্বনি থামতে প্রায় পাঁচ মিনিট

লেগেছিল। তারপর স্বামিজী সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে অল্প কটি কথা বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। পরদিন শিকাগোর সমস্ত খবরের কাগজে স্বামিজীর ছবি ও বক্তৃতা ছাপা হ'ল। সকল কাগজে লিখলে, স্বামিজীর বক্তৃতাই সেদিন সকলের চেয়ে ভাল হয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় স্বামিজীর মস্ত মস্ত ছবি বসান হয়েছিল, আর তার সামনে রাতদিন লোকের ভিড় লেগে থাকত। এ ভিড় সরাবার জন্য পুলিশের দরকার হয়েছিল। বিধাতা সেদিন বিবেকানন্দের কপালে নিজহাতে বিজয়-টিকা পরিয়ে দিলেন। অনাদৃত হিন্দুসন্তান, অবজ্ঞাত ভারতমাতার সন্তান বিবেকানন্দ সেদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে হিন্দুধর্মের ও জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করলেন।

সেদিনের পর স্বামিজী ধর্মসভায় আরো অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর কথা শুনবার জন্য এত বেশী লোক হ'ত যে বলবার নয়। তিনি কখনও বলেন নি, আমার হিন্দুধর্মই একমাত্র সত্যধর্ম, আর সব ধর্ম মিথ্যা। তিনি তাঁর গুরুর জীবনে দেখেছিলেন এবং তাঁর কাছে বিশেষ করে শিখেছিলেন, যত মত তত পথ। যত ধর্মমত জগতে আছে, সবই ভগবানের কাছে যাবার এক একটি পথ এবং সবই সত্য।

হিন্দু ধর্মের বহু মত, বহু শাখা, বহু প্রশাখা, কত তার শাস্ত্র! সকলের উপর বেদ। বেদের সারভাগের নাম বেদান্ত। স্বামিজী এমেরিকাতে এই বেদান্তের কথা বিশেষ ভাবে প্রচার করেছিলেন। সে-সব কথায় এমেরিকাবাসীদের মনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন এনেছিল।

ইউরোপ এমেরিকার লোকেরা আজকাল শিক্ষায় বিজ্ঞানে কলকারখানায় খুব উন্নতি করেছে। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে ভারত একদিন তার চেয়েও বেশী উন্নতি করেছিল। ভারতের সব বিষয়েই আজ অবনতি হয়েছে। এ অবনতির অবস্থায়ও ভারতে এত ধর্মভাব আছে, যা জগতের আর কোথাও নাই। এখনও ভারত সমস্ত পৃথিবীকে বহু বৎসর ধরে ধর্মতত্ত্ব শেখাতে পারবে।

মানুষে যা কখনও কল্পনা করে নি, স্বপ্নেও ভাবে নি, বিধাতার ইচ্ছায় তাই হ'ল। এমেরিকার শত শত লোক স্বামিজীর ধর্মকথায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্য হতে লাগল। স্বামিজী তখন এমেরিকার নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করতে লাগলেন।

ভারতের এ অভাবনীয় গৌরব, হিন্দুধর্মের এ অপূর্ব মহিমা, স্বামিজীর এ অমানুষিক সফলতা দেখে এমেরিকার বহু গোঁড়া পাদরি ভয়ানক চটে গেল। দল বেঁধে তারা তাঁর বিরুদ্ধে লাগল। তাঁকে তারা নানাভাবে অপমানিত, অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। তাঁর নামে নানাপ্রকার মিথ্যা কথা রচনা করে তারা খবরের কাগজে প্রকাশ করতে লাগল। স্বামিজীর অন্তরে ছিল পবিত্রতার জ্বলন্ত আগুন, আত্মবিশ্বাসের তড়িত-শক্তি এবং গুরুর প্রতি অগাধ ভক্তি। স্বামিজী এসব নিন্দা-কুৎসার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সিংহের মত সারা দেশময় ভারতের বাণী, হিন্দুর ধর্মকথা বলে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর সফলতা, তাঁর গৌরব দিন দিনই বেড়ে চলল।

তিন বৎসরের অধিক কাল তিনি এমেরিকায় ধর্মপ্রচার করে ভারতে ফিরে এলেন। ভারতের লোকেরা স্বামিজীর কাজে বড়ই গৌরব, বড়ই আনন্দ বোধ করতে লাগল। স্বামিজী যখন সিংহলের কলম্বোতে জাহাজ হতে নামলেন, অমনি হাজার হাজার লোক তাঁকে অভ্যার্থনা করে নিয়ে গেল। সিংহলের ও ভারতের চারদিক থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। তিনি সিংহলের কয়টি স্থান দেখে দক্ষিণ ভারতে পদার্পণ করলেন। ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সর্বত্র তাঁকে যেরূপ বিপুল ভাবে অভ্যার্থনা ও মান দেওয়া হয়েছিল, কোনও রাজার ভাগ্যেও সে সম্মান আজ পর্যন্ত ভারতে লাভ হয় নি। অভ্যার্থনার উত্তরে তিনি ভারতের সর্বত্র যে-সব বক্তৃতা করেছিলেন, সে সব 'ভারতে বিবেকানন্দ'

বেলুড় মঠ

পুস্তকে বিস্তারিত ভাবে আছে। সে-সব বক্তৃতায় সারা ভারতে তখন সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

কিছুদিন পর বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাসী ভাইদের নিয়ে

তাঁর গুরুদেবের নামে করলেন মঠ প্রতিষ্ঠা, গঙ্গার পশ্চিম কূলে, বেলুড়ে।

স্বামিজী তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে একটি বিশেষ জিনিস পেয়েছিলেন—নরনারায়ণ সেবা। আমাদের ধর্ম-পুস্তকে আছে, পরমেশ্বর জীবে জীবে সারা বিশ্বে রয়েছেন। প্রতিমাতেও তিনিই আছেন। সাধারণ লোক দেবপ্রতিমার মধ্যে বা অন্যত্র কোথাও ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। যারা খুব ভক্তিভাবে তাঁর পূজা করে, অন্তরের ভক্তির জোরে তারা তাঁর দর্শন পায়। মানুষ যদি দরিদ্র পতিত কাঙ্গাল অনাথ রুগ্ন আর্ত দীন দুঃখীদের মধ্যে নারায়ণ আছেন, এই বিশ্বাস ক'রে এদের সেবা করে, তবে কালে এদের মধ্যেও সে নারায়ণ দর্শন করে ধন্য হয়। নারায়ণসেবার জন্য স্বামিজী করলেন রামকৃষ্ণ মিশন নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা। বর্তমান রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখা ভারতের প্রায় সর্বত্র স্থাপিত হয়েছে এবং ভারতের বাহিরে ইউরোপ এমেরিকা এবং অন্যান্য কয়েকটি দেশেও বহু আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এগুলোর ভিতর দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর মহাকল্যাণ সাধিত হচ্ছে।

দেশের যুবকরা দলে দলে স্বামিজীর চরণ-তলে এসে গ্রহণ করলে সেবার ব্রত, ত্যাগের দীক্ষা। আজ ভারতের যেখানেই বন্যা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, সেখানেই নর-নারায়ণের সেবার জন্য দলে দলে লোক গমন করে—তার মূলে রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের অনুপ্রেরণা।

বিবেকানন্দের জীবনী, বিবেকানন্দের কাহিনী বলতে গেলে এক মহাভারতেও শেষ হবার নয়। চিত্রের চেয়েও তা সুন্দর, সঙ্গীতের চেয়েও মধুর, উপন্যাসের চেয়েও মনোহর, স্বপ্নের চেয়েও আশ্চর্য। তাঁর জীবনের বড় বড় ঘটনাগুলো
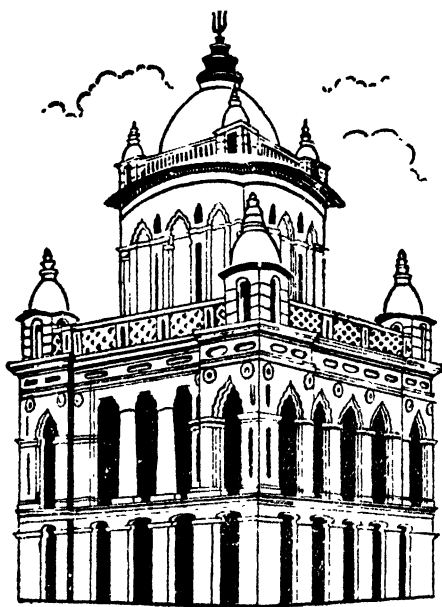
স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির, বেলুড় মঠ

যেমন মহৎ, ছোট ছোট গুলোও তেমনি মহৎ, তেমনি সুন্দর। আর এসব ছোট ছোট ঘটনাগুলোই মহাপুরুষদের মহত্ত্বের প্রকৃত প্রমাণ। বয়স চল্লিশ পূর্ণ হবার আগেই তিনি শরীর

ছেড়ে চলে গেছেন। মাত্র উনত্রিশ বৎসর বয়সে শিকাগোয় তিনি সিংহ-বিক্রমে দাঁড়িয়েছিলেন। শিকাগোর বক্তৃতা হ'তে বেলুড় মঠে দেহত্যাগ পর্যন্ত, এই এগার বৎসরে যে রত্নরাজি, যে ভাবরাশি তিনি সারা ভুবনে ছড়িয়ে গেছেন সে সব আয়ত্ত করতে আমাদের বহু শতাব্দী কেটে যাবে।

এমেরিকায় স্বামিজীকে নাম দিয়েছিল, তুফানী সাধু (সাইক্লোনিক মংক্)। ঝড় যেমন চকিতে এসে সব উলটে পালটে দিয়ে চলে যায়, তিনিও তেমনি হঠাৎ সেদেশে গিয়ে পলকে প্রলয় কাণ্ড করে এসেছেন। নেপলেওঁ-র বীরত্বের কথা আমরা জানি, আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয় কাহিনী আমরা জানি, কিন্তু স্বামিজীর বীরত্ব তার চেয়েও বড়, স্বামিজীর দিগ্‌বিজয় তার চেয়েও গৌরবের। শীঘ্রই সে সময় আসবে, যখন আমরা প্রাণে প্রাণে একথা বুঝতে পারব।

স্বামিজী যদি জগতে কোন বস্তুকে ঘৃণা করে থাকেন, তা দুর্বলতা ও ভয়। স্বামিজীর কথায় ও স্বামিজীর উপদেশে আছে সূর্যের তেজ, বিদ্যুতের শক্তি, রাজার শাসন, আর আছে জননীর বিশ্ববিজয়ী প্রেম। বিবেকানন্দের বাণী —শক্তির বাণী। ভয়ের দুর্বলতার সেখানে স্থান নেই। বিবেকানন্দের কথায় ঘুমন্ত মানুষ জেগে ওঠে, মৃত পায় প্রাণ, অন্ধের চোখ ফোটে, কুড়ে হয় বীর। যাদের অন্তরে নিজের উন্নতির জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য, দেশের উন্নতির জন্য ইচ্ছা আছে, বিবেকানন্দের বাণী তাদের কাছে অমৃতের মত।

ভয়ের দুর্বলতার কাপুরুষতার যুগ শেষ হয়ে গেছে। নবীনের দল নব-উৎসাহে নব-প্রাণে নব-আশায় আজ জেগে উঠেছে। বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দের নূতন নূতন ছবি জননীর কোল আলো করে দেশের ঘরে ঘরে জন্ম গ্রহণ করুক। স্বর্গের চেয়েও বড়, স্বর্গের চেয়েও প্রিয়, আমাদের জননী জন্মভূমির মুখে আনন্দে গৌরবে হাসি ফুটে উঠবে, মহানিশার অবসান হয়ে আমাদের জন্মভূমির আকাশ বাতাস নবীন উষার অরুণ আলোকে আলোকিত হয়ে উঠবে।

রামকৃষ্ণদেবের মন্দির, বেলুড় মঠ

স্বামী বিবেকানন্দ

শিকাগোয় তোলা ছবি)

মদালসা

এমেরিকার নানাস্থানে ক্রমাগত বক্তৃতা দিয়ে স্বামিজী বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সে সময় তিনি নিউ ইয়র্কের কাছে 'থাউজেণ্ড আয়লেণ্ড পার্ক' নামক একটি নির্জন স্থানে কয়েক সপ্তাহ বিশ্রাম করেছিলেন। তাঁর কাছে বিশেষভাবে শিক্ষালাভ করবার জন্য কয়জন নরনারী সেখানে সমবেত হন। প্রত্যহ প্রাতে স্বামিজী যেসব উপদেশ দিতেন, তাঁদের একজন সে সব লিখে রাখতেন। সেগুলোই পরে একত্র করে দেববাণী পুস্তক (ইন্‌স্‌পায়ার্ড টক্‌স্‌) প্রকাশিত হয়। সে সময় স্বামিজী তাঁর উপদেশের মধ্যে মদালসার গল্প তাঁর শিষ্যদের কাছে অতি সংক্ষেপে বলেছিলেন। মদালসার কাহিনী মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে।

পুরাকালে শত্রুজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। সে সময় বহু মুনি ঋষি বনে আশ্রম করে তপস্যা করতেন। দানব, রাক্ষস ও অসুরেরা মাঝে মাঝে মুনিদের আশ্রমে এসে বড় উৎপাত করত। দেশের রাজা তখন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের মেরে বা তাড়িয়ে দিয়ে আশ্রম রক্ষা করতেন। মুনি ঋষিরা তখন নিশ্চিন্ত মনে তাঁদের ধর্মকর্মে মন দিতেন।

শত্রুজিৎ যখন রাজা, তখন গালব নামে এক মুনি হিমালয়ে আশ্রম করে তপস্যা করছিলেন। দেশ বিদেশে গালবের খুব নাম ছিল। দানবেরা এক সময় গালবের আশ্রমে এসে উৎপাত আরম্ভ করলে। রাজা শত্রুজিৎ এ সংবাদ জানতে পেরে দানব দমন করবার জন্য তাঁর পুত্র ঋতধ্বজকে গালবের আশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন।

রাজকুমার ঋতধ্বজ খুব বীর ছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে তিনি তীর ধনু হাতে নিয়ে আশ্রম পাহারা দিতে লাগলেন। তাঁর ভয়ে দানবেরা সব পালিয়ে গেল। দানবদের মধ্যে পাতালকেতু ছিল বড় দুর্দান্ত। গায়ে ছিল তার যেমন বল, মাথায় ছিল তেমনি দুষ্ট বুদ্ধি। দানবদের একটি ক্ষমতা আছে, ইচ্ছা করলে তারা নিজের চেহারা বদলে যে-কোন জীব জন্তুর রূপ ধরতে পারে।

একদিন পাতালকেতু একটা শূকরের রূপ ধরে গালবের আশ্রমে এসে বড় উৎপাত আরম্ভ করলে। গালব তখন পূজায় বসেছেন। ভীষণাকার শূকরকে দেখে তাঁর শিষ্যেরা চীৎকার করে উঠলেন। কুমার ঋতধ্বজও তখনি শূকরের দিকে তীর ছুড়লেন। তীর গিয়ে শূকরের পেটে বিঁধে গেল। পেটে তীর নিয়েই শূকর ছুটে পালাতে লাগল। ঋতধ্বজও তার পেছনে মহাবেগে ঘোড়া চালিয়ে দিলেন।

অনেক দূর যেতে যেতে শূকর যেন কোথায় লুকিয়ে গেল। ঘোড়াও ঋতধ্বজকে নিয়ে হঠাৎ মস্ত বড় এক গর্তে পড়ে গেল। কিন্তু কারো গায়ে আঘাত লাগল না এবং আরো আশ্চর্যের বিষয়, দেখা গেল গর্তের ভিতর বেশ চমৎকার ঢালু রাস্তা আছে, তবে বড় অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যেই ঢালু পথে ঘোড়া ছুটে চলল। একটু পরেই ঋতধ্বজ আলো দেখতে পেলেন, আর দেখলেন সামনে এক মস্ত রাজপুরী।

রাজকুমার তো একেবারে অবাক। যেদিকে তাকান, দেখেন 'বিশাল বিশাল প্রাসাদ আকাশ ভেদ করে উঠেছে।

তিনি চারদিকে দেখে বেড়াতে লাগলেন। রাজকুমার মনে মনে ভাবলেন, বুঝি শূকরটা এখানে এসে লুকিয়েছে। কিন্তু শূকরকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। সামনেই একটা বড় বাড়ি। বাড়িটি যেমনি বড় তেমনি সুন্দর। রাজকুমার শুনতে পেলেন তার ভিতর থেকে যেন একটু কান্নার শব্দ আসছে। কুমারের মনে বড় কৌতূহল হ'ল। ঘোড়াকে বাইরে বেঁধে তিনি বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন। ভিতরে গিয়ে দেখলেন পরমা সুন্দরী এক রাজকুমারী কাঁদছেন।

রাজকুমারীর রূপে যেন রাজবাড়ি আলো হয়ে আছে। মানুষের এত রূপ হতে পারে কুমার কখনও তা ভাবেন নি, স্বপ্নেও দেখেন নি। কুমারী কাঁদছেন আর চোখ দিয়ে যেন বিন্দু বিন্দু মুক্তা ঝরছে। মুগ্ধ হয়ে কুমার চেয়ে রইলেন। রাজকুমারকে দেখে কুমারীর কান্না গেল থেমে। তিনিও অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কুমারের দিকে।

রাজকুমারী বললেন, কে তুমি এ যমপুরীতে এসেছ? এটি পাতালকেতু দানবের বাড়ি। তোমাকে দেখলে এখনি সে মেরে ফেলবে।

কুমার হেসে উত্তর করলেন, তোমার সে ভয় নেই। পাতালকেতুর দেখাটা একবার পেলে হত। দেখতুম কে কাকে মারে।

কুমারের কথায় রাজকুমারীর প্রাণে এল বল, মনে এল আনন্দ। ঋতধ্বজ তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন আর পাতালকেতুর পুরীতে আসার কাহিনী বললেন। তখন

রাজকুমারীও তাঁর কাহিনী, তাঁর পরিচয় একে একে কুমারকে বললেন।

রাজকুমারীর নাম মদালসা। স্বর্গের গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর কন্যা তিনি। বিয়ে করবার জন্য দানব পাতালকেতু তাঁকে স্বর্গ থেকে চুরি করে নিয়ে এসেছে। মদালসা পাতালকেতুকে বিয়ে করতে কিছুতেই রাজি হন নি। তাই দানব তাঁকে বন্দী করে রেখেছে আর বলেছে, আসছে কাল জোর করে তাঁকে বিয়ে করে ফেলবে।

মদালসার দুঃখে কুমারের মনেও দুঃখ হল। তিনি মদালসাকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে যাই।

মদালসা রাজি হলেন। তখন ঋতধ্বজ মদালসাকে ঘোড়ার পিঠে নিজের পেছনে বসিয়ে পাতালপুরী থেকে রওনা হলেন। পাতালকেতুর দলের অনেক দানব এসে তখন ঋতধ্বজকে আক্রমণ করলে। ঋতধ্বজও মহাপরাক্রমে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন। কুমারের বাণে অনেক দানবই প্রাণত্যাগ করলে আর বাকি পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে।

তখন মদালসাকে নিয়ে ঋতধ্বজ অনায়াসে পাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন আর নিজের বাড়ির দিকে তীরবেগে ঘোড়া চালিয়ে দিলেন। মদালসাকে দেখে আর বহুদিন পর ছেলেকে পেয়ে রাজা রানী ভারি আনন্দিত হলেন। মহাধুমধামে মদালসার সাথে ঋতধ্বজের বিয়ে হয়ে গেল। রাজকন্যাকে দেখে সবাই বলতে লাগল, এমন সুন্দরী

মেয়ে পৃথিবীতে নেই, পাতালে নেই, এমন কি স্বর্গেও নেই।

রাজবাড়ির দাস দাসী লোক লস্কর সকলের মুখে এক কথা, প্রজাদের ঘরে ঘরে হাটে মাঠে সর্বত্র এক অলোচনা, —রূপে ও বীরত্বে রাজকুমার যেমন কাতিকের মত, রানী-বউমাও তেমনি রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। রাজা ভাবলেন, ছেলে আমার বংশের মান রাখুক, পূর্বপুরুষদের মুখ উজ্জ্বল করুক। রানী ভাবলেন, বউ ছেলে আমার বেঁচে থাকুক, পদ্ম ফুলের মত নাতি নাতনি এসে বউএর কোল আলো করুক।

মদালসা পরম যত্নে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করতে লাগলেন। রাজকুমারের পরম সুখে দিন যাচ্ছিল। সুখের দিন কিন্তু চিরকাল থাকে না। দিনের পর রাত আসে, রাতের পর দিন। রাজপুরীতে সংবাদ এল, আবার দানবেরা এসে মুনিদের আশ্রমে উৎপাত আরম্ভ করেছে। এ সংবাদে রাজা চিন্তিত হলেন। ঋতধ্বজকে ডেকে তিনি দানবদের দমন করবার জন্য আদেশ দিলেন। যুদ্ধের সাজ পরে কুমার পিতামাতার চরণে প্রণাম করলেন, মদালসার কাছে বিদায় নিলেন, তারপর ঘোড়ায় চড়ে মুনিদের আশ্রমের দিকে যাত্রা করলেন। যাত্রার সময় রাজা আশীর্বাদ করলেন, পুত্রের মঙ্গলের জন্য রানী তেত্রিশ কোটি দেবতার আশিস ভিক্ষা করলেন, মদালসা সজল নয়নে পতিকে বিদায় দিলেন।

গালবের আশ্রমে ঋতধ্বজের হাতে বাণবিদ্ধ হয়ে শূকর-রূপে পাতালে গিয়ে পাতালকেতু প্রাণত্যাগ করেছিল।

পাতালকেতুর এক ভাই ছিল। তার নাম তালকেতু। ঋতধ্বজের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য সে বহুকাল থেকে চেষ্টা করছিল। সে এক মুনির বেশ ধরে যমুনার তীরে এক আশ্রম তৈরী করেছিল। ঋতধ্বজ আসছেন দেখে তালকেতু এগিয়ে এসে তাঁকে তার আশ্রমে নিয়ে গেল। তালকেতুর যত অনুচর সকলেই এক এক মুনির বেশ ধরে যমুনার তীরে ধর্মকর্মে লেগে গেল।

রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে তীর ধনু নিয়ে চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কোথাও দৈত্য দানব অসুরের টিকিও দেখতে পেলেন না। তালকেতু তাঁকে বুঝিয়ে বললে—কুমার, এদিকে দানবের বড় উৎপাত। কী দুঃখে কী যন্ত্রণায় যে আমাদের দিন যায়! আপনাকে দেখে দানবেরা সব ভয়ে পালিয়েছে। যদি আপনি এখান থেকে এখনই চলে যান, তাহলে আবার এসে তারা উৎপাত আরম্ভ করবে। তাই আমাদের সকলের ইচ্ছা, আপনি এখানে কিছুদিন থাকেন।

রাজকুমার সরল মনে তালকেতুর সকল কথা বিশ্বাস করলেন। একদিন তালকেতু কুমারের কাছে গিয়ে বললে, বহুকাল থেকে আমার একটি যজ্ঞ করবার ইচ্ছা। কিন্তু যজ্ঞের দক্ষিণা আমি সংগ্রহ করতে পারি নি। দক্ষিণা ছাড়া যজ্ঞে কোন ফল হয় না। আপনি যদি আপনার মুক্তা-হারটি আমায় দান করেন, তবেই আমার যজ্ঞ পূর্ণ হয়।

অতি আনন্দের সহিত কুমার নিজের গলা হতে মুক্তাহার খুলে তালকেতুর হাতে দিলেন। মুক্তাহার হাতে পেয়ে

তালকেতু পরমানন্দে যমুনার দিকে চলে গেল। রাজকুমার ভাবলেন, মুনি বুঝি যজ্ঞের জন্য চলে গেলেন। তাই অতি সতর্কভাবে তিনি তার আশ্রম পাহারা দিতে লাগলেন।

যজ্ঞের কথা সবই ফাঁকি। মায়াবী তালকেতু এক বৃদ্ধ মুনির রূপ ধরে একেবারে শত্রুজিৎ রাজার সভায় এসে উপস্থিত

হ'ল। মুনিকে দেখে রাজা সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, হাত যোড় করে বললেন, স্বাগতম্ স্বাগতম্ দেবতা, আজ আমার পরম সৌভাগ্য। আসুন, আসন গ্রহণ করুণ।

মুনি বললেন, মহারাজ এক মহাবিপদ ঘটেছে। আমি বৃদ্ধ তাপস, আমাকে পর্যন্ত এ ঘটনা বড় বিচলিত করে দিয়েছে।

মুনির চোখদুটি ছল ছল করতে লাগল। তাঁর কথা শুনে রাজা পাত্র মিত্র সবার মনেই বিষম উৎকণ্ঠা উপস্থিত হ'ল। মুনি বলতে লাগলেন, যমুনার তীরে আমার আশ্রম। আমার আশ্রমের কাছে একদিন রাজকুমার ঋতধ্বজের সঙ্গে দানবদের মহাযুদ্ধ হয়। কুমারের বীরত্ব দেখবার জিনিস বটে। কিন্তু দুরন্ত দানবেরা কুমারকে পরজিত করে তাঁর প্রাণনাশ করেছে। এই দেখুন তাঁর গলার মুক্তাহার। শূদ্র তাপসেরা তাঁর দেহ নদীতীরে সৎকার করেছেন। কি হতভাগ্য আমি! আমাকেই এ নিষ্ঠুর সংবাদ বহন করে আনতে হল! হায় হায়!

রাজা মুক্তাহার হাতে নিয়ে দেখলেন, সত্যিই কুমারের হার। মুনি বিদায় নিলেন। এক কালো বিষাদের ছায়া সমস্ত রাজপুরী আচ্ছন্ন করে ফেললে। পতির মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মনের দুঃখে মদালসা নিজের প্রাণ দিলেন। রাজ্যে হাহাকার উঠল।

যমুনার তীরে তালকেতু ফিরে দেখলে রাজকুমার তার আশ্রম পাহারা দিচ্ছেন। বড় আনন্দিত হয়ে তালকেতু তাঁকে বললে, বাবা, আপনার দয়ায় আমার যজ্ঞ পূর্ণ হয়েছে। বহুদিন হয়ে গেল, আপনি বাড়ি ছেড়ে এসেছেন। আমি

দিব্য চক্ষে দেখছি, আপনার পিতামাতা, আপনার স্ত্রী সকলেই আপনার জন্য বড়ই চিন্তিত আছেন। এখন তো কোথাও দানবের উৎপাত নেই। আপনার ভয়ে সবাই পাতালে পালিয়েছে। এবার আপনি বাড়ি ফিরে যান। আবার যখন দানবের অত্যাচার হবে, আমরা আপনাকে নিশ্চয়ই সংবাদ পাঠাব।

তালকেতুর কথায় ঋতধ্বজ বাড়ি ফিরে গেলেন। বাড়ি গিয়ে সকল কথা শুনে ঋতধ্বজের মনে এত দুঃখ হল যে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি নিজের ঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সারাদিন কুমারের কিছুই ভাল লাগত না। তিনি কারও সঙ্গে কথা বলতেন না, দেখা করতেন না, কেবল মদালসার কথা ভাবতেন আর মাঝে মাঝে কাঁদতেন। রাজকুমার কী মানুষ ছিলেন, আর দেখতে না দেখতে কী হয়ে গেলেন!

নাগরাজ ছিলেন সে সময় অন্য এক দেশের রাজা। তাঁর দুটি ছেলে—আর তাঁরা ছিলেন কুমার ঋতধ্বজের পরম বন্ধু। তাঁরা ঋতধ্বজকে প্রাণের সহিত ভালবাসতেন। মদালসার মৃত্যুর কথা, ঋতধ্বজের দুঃখের কথা ধীরে ধীরে তাঁদের কানে গিয়ে পৌঁছল। ছেলেরা নাগরাজকে সকল কথা জানিয়ে বললেন, মদালসাকে না পেলে ঋতধ্বজ প্রাণে বাঁচবেন না।

এ কথায় নাগরাজের মনেও বড় দুঃখ হল। তিনি ভাবলেন, যেরূপেই হোক মদালসাকে এনে আবার কুমারকে দিতে হবে। এই ভেবে তিনি হিমালয়ে চলে গেলেন এবং খুব

কঠোর তপস্যায় মন দিলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে শিব দেখা দিয়ে বললেন, বর লও।

নাগরাজ যোড়হাতে উত্তর করলেন, দেবতা, যদি প্রসন্ন হয়ে থাক তবে এই বর দাও, যেন মদালসাকে আমি কন্যারূপে পাই। যে বয়সে যে রূপ ও গুণ নিয়ে মদালসা মারা গেছেন, যেন তিনি সেই বয়স, সেই রূপ, সেই গুণ নিয়ে আমার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বজন্মের সকল কথাই যেন তাঁর মনে থাকে।

শিব বললেন, তথাস্তু, শ্রাদ্ধের দিন শ্রাদ্ধের একটি পিণ্ড তুমি খেয়ে ফেলো, মদালসা তোমার ডান কান থেকে জন্ম গ্রহণ করবেন। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাঁর আগের বয়স, আগের রূপ, আগের গুণ, সব পাবেন আর আগের জন্মের কথা সবই তাঁর মনে থাকবে।

এই বলে শিব চলে গেলেন। নাগরাজও তখন বাড়ি ফিরে এলেন। তারপর শ্রাদ্ধদিনে নাগরাজ শিবের কথামত শ্রাদ্ধের একটি পিণ্ড খেয়ে ফেললেন। তাঁর ডান কান হতে তখন মদালসার জন্ম হ'ল। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মদালসা তাঁর আগের বয়স রূপ গুণ সবই পেলেন। এতসব ঘটনা হয়ে গেল, নাগরাজ কারও কাছে কিছু বললেন না। তিনি মদালসাকে নিয়ে অন্তঃপুরে লুকিয়ে রেখে ছেলেদের কাছে গিয়ে বললেন, তোমাদের বন্ধু ঋতধ্বজকে তোমরা নিমন্ত্রণ করে আমাদের বাড়ি নিয়ে এস।

বাবার কথায় দুই ভাই মহানন্দে ঋতধ্বজের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। ঋতধ্বজ কোথাও যেতে চাইলেন না, বন্ধুদের

সাথেও বেশী কথা কইলেন না। রাজা রানী ভাবলেন, যদি ছেলে নাগরাজদের বাড়ি যায়, একটু ঘুরে ফিরে আসে, তাহলে ভালই হয়। হয়তো তার মতিগতি ফিরতেও পারে। রাজা রানী তাঁকে কত বোঝালেন, বন্ধুরাও কত বললেন। শেষকালে কুমার রাজি না হয়ে পারলেন না।

নাগরাজের ছেলেরা কুমারকে বাড়ি নিয়ে এলেন। নাগরাজ তাঁকে খুব আদর যত্ন করলেন। খাওয়া দাওয়া শেষ হবার পর তিনি কুমারকে বললেন, বাবা, তুমি আমার ছেলেদের বন্ধু। আমার ছেলেরা আমার কাছে যেমন, তুমিও তেমনি। বল, তুমি কি চাও, কি দিয়ে আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি।

ঋতধ্বজ ধীরে ধীরে উত্তর করলেন, মহারাজ, আপনার দয়া, আপনার আদর যত্ন আমার চিরকাল মনে থাকবে। কিন্তু সংসার, ধন, মান, রাজ্য এমন কিছুই দেখছি না, যা পেলে আমি বাস্তবিকই সুখী হতে পারি।

এই বলে কুমার কাতর দৃষ্টিতে বন্ধুদের পানে চাইলেন। বন্ধুরা তাঁর অন্তরের বেদনা বুঝতে পেরে নাগরাজকে বললেন, বাবা, মদালসাকে হারিয়ে বন্ধুর মনে আমাদের কিছুমাত্র শান্তি নেই। মদালসা ছাড়া সংসারে আর কোন বস্তুই তাঁর মনে শান্তি দিতে পারবে না।

নাগরাজ উত্তর করলেন, একবার যে মারা গেছে, তাকে পাওয়া—এক স্বপ্নে সম্ভব, না হয় আসুরী মায়াতে সম্ভব।

কুমার বললেন, মহারাজ, যদি কোন মায়াবীর মায়াতেও মদালসাকে একবার দেখতে পেতুম!

বাছা, মায়া যদি দেখতে চাও তবে দেখ :—এই বলে নাগরাজ অন্তঃপুরের গুপ্তগৃহ থেকে মদালসাকে ঋতধ্বজের সামনে নিয়ে এলেন। হঠাৎ মদালসাকে দেখে বিস্ময়ে ও আনন্দে কুমার একেবারে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। অনেক সেবা যত্নের পর তিনি সুস্থ হলেন। নাগরাজের ছেলেরা মদালসার কথা একটুও জানতেন না। নাগরাজ সকলের কাছে মদালসার কাহিনী আগাগোড়া বললেন। ঋতধ্বজের অন্তরে আবার আনন্দ ফিরে এল, মুখে হাসি ফুটল। কৃতজ্ঞ অন্তরে তিনি নাগরাজকে প্রণাম করলেন, বন্ধুদের কাছে বিদায় নিলেন এবং মদালসাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলেন।

রাজা রানী দেখে অবাক। আরো অবাক হয়ে তাঁরা কুমারের মুখে মদালসার কাহিনী শুনলেন। কাডা নাকাড়া বেজে উঠল, দুয়ারে দুয়ারে রসনচৌকি সুর ধরলে, সন্ধ্যার সাথে সাথে রাজপুরীতে লক্ষ প্রদীপ হাসতে লাগল। রাজকুমারকে দেখবার জন্য, রানীবউমাকে দেখবার জন্য দলে দলে হাজারে হাজারে প্রজারা রাজবাড়িতে আসতে লাগল।

মদালসা আগের মতই শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা ও স্বামীর যত্ন করতে লাগলেন। মদালসার সবই আগের মত, কেবল একটু যেন বেশী গম্ভীর। রানী ভাবলেন, ও কিছুই নয়, বাছার আমার বয়স হচ্ছে তো? ও বয়সের ধর্ম, আর কিছুই নয়।

মানুষ ঘুমালে কত স্বপ্ন দেখে। আবার জাগলে স্বপ্ন সব কোথায় মিলিয়ে যায়। স্বপ্ন সবই মিথ্যা। কিন্তু মানুষ যত সময়

ঘুমিয়ে থাকে, আর স্বপ্ন দেখে, তত সময় বুঝতে পারে না যে স্বপ্ন মিথ্যা বা জাগবার পর এসব আর কিছুই থাকবে না।

জন্মের আগে কি ছিল, মরবার পর কি হবে, এ সব জানতে পারে না বলেই এ সংসারে সব জিনিসকে মানুষ সত্য বলে মনে করে। মানুষ মনে করে চিরকালই সংসার এভাবে থাকবে। যারা পূর্বজন্মের কথা মনে করতে পারেন আর মৃত্যুর পর কি হবে তাও জানতে পারেন, তাঁদের নাম জ্ঞানী। তাঁরা এ সংসারকে স্বপ্নের মতই মনে করেন।

মদালসার মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু শিবের বরে মৃত্যুর কথা, পূর্বজন্মের কথা সবই তাঁর মনে হত। এজন্য তিনিও ধীরে ধীরে একজন জ্ঞানী হয়ে গেলেন। তিনি ভাবতেন, শরীর, স্বামী, রাজ্য, ধনসম্পদ কিছুই থাকবে না। এসব আজ আছে, কাল নেই। মানুষের অন্তরে যে আত্মা আছে, শুধু তাই থাকবে আর সবই নষ্ট হয়ে যাবে। মদালসা মনে মনে এসব কথা ভাবতেন, কিন্তু বাইরে কিছুই বলতেন না, আগের মতই সংসারের কাজকর্ম, চলাফেরা করতেন।

অনেক দিন কেটে গেল। রাজা শত্রুজিৎ মারা গেলেন, ঋতধ্বজ হলেন রাজা। রাজা হয়ে ঋতধ্বজ প্রজাগণকে নিজের সন্তানের মত পালন করতে লাগলেন। ঘরে ঘরে নূতন রাজার প্রশংসা আরম্ভ হ'ল।

এই সময় মদালসার একটি ছেলে হল। ছেলে নয়, যেন দেবপুত্র। রাজা আদর করে তার নাম রাখলেন বিক্রান্ত। মদালসা কিছুই বললেন না শুধু একটু হাসলেন। শুক্ল পক্ষের

চাঁদের মত বিক্রান্ত দিনে দিনে তিলে তিলে বড় হতে লাগল। পরম যত্নে রানী মদালসা তাকে মানুষ করতে লাগলেন। যখন তার একটু বয়স হল, মদালসা তখন তাকে নানাভাবে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। একদিন বিক্রান্ত কি কারণে ভয় পেয়ে কাঁদছিল। মদালসা তাকে কোলে নিয়ে আদর করে বলতে লাগলেন, বাছা, তুমি কাঁদছ কেন? তোমার কিসের ভয়? তোমাকে কেউ নিতে পারবে না, মারতে পারবে না, দুঃখ দিতে পারবে না। তুমি কে? তুমি এ শরীরটা নও। তুমি আত্মা। তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, ভয় নেই। এ শরীরটা কাপড় চোপড়ের মত তুমি পেয়েছ। এটি এক সময় নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু তাতে তোমার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। তোমার বিক্রান্ত নাম আমরাই দিয়েছি। এটি তোমার সত্যিকার নাম নয়। তুমি আনন্দময় বাছা, তুমি আনন্দময়।

মার আদরে, মার কথায় বিক্রান্তের কান্না থামল, ভয় গেল। প্রথম প্রথম মার কথা সে বিশেষ কিছুই বুঝত না, কিন্তু তবুও তার বড় ভাল লাগত। তারপর ধীরে ধীরে সে মার উপদেশ একটু একটু বুঝতে পারত। বাগানের এক গাছে বিক্রান্তের জন্য ছোট সুন্দর একটি দোলনা তৈরী হয়েছিল। রোজ বিকালে রানী দোলনায় বসিয়ে তাকে দোল দিতেন আর মধুর সুরে ধীরে ধীরে গান করতেন। রানীর গলা ছিল বড় মিষ্টি। রানীর গানের কথাগুলো আর কিছুই নয়, শুধু জ্ঞানের কথা, উপদেশের কথা।

আরো কিছু বড় হয়েই বিক্রান্ত সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল। ছেলে-বয়স থেকে মার কাছে নানা উপদেশ শুনে শুনে তার মনে সত্যিকার জ্ঞানের উদয় হয়েছিল। সে বুঝতে পারলে, সংসারে কিছুই চিরদিন থাকবে না, সংসারের সবই অসার, কেবল জ্ঞান ও ধর্মই একমাত্র সারবস্তু। এ জ্ঞান ও ধর্ম আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আছে। যে প্রকাশ করতে চেষ্টা করে, তারই জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

বিক্রান্ত সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল। রাজা অন্তরে তাতে বড়ই দুঃখ পেলেন। কিন্তু রানীকে তিনি কিছুই বললেন না। রানী ভাবলেন, ছেলে ঠিক কাজই করেছে। এই সময় রানীর আর একটি ছেলে হল। সেও বিক্রান্তের মতই সুন্দর। রাজা আদর করে নাম রাখলেন সুবাহু। এবারও মদালসা হাসলেন।

সুবাহু ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। রানী বিক্রান্তকে যেভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সুবাহুকেও ঠিক তেমনি শিক্ষা দিতে লাগলেন। সুবাহু যখন বড় হ'ল, সেও দাদার মত সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল।

মদালসার তখন আর একটি ছেলে হ'ল। রাজা নাম রাখলেন অরিন্দম। মদালসা তাকেও বিক্রান্ত ও সুবাহুর মত শিক্ষা দিলেন এবং সেও পরে সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেল।

মদালসার আর একটি ছেলে হ'ল। এটিই তাঁদের শেষ সন্তান। রাজা ভারি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ, রানী যে একে একে সব ছেলেকে সংসার ত্যাগী করে দিলেন। রাজা মদালসাকে এত ভালবাসতেন যে, তাঁর কোন্ কাজেই

তিনি কথা বলতেন না বা বাধা দিতেন না। রানী যখন একে একে সব ছেলেকেই সন্ন্যাসী করে দিলেন, তখন রাজা আর স্থির থাকতে পারলেন না। একদিন এসে রানীকে তিনি বললেন, রানি, বড় ছেলে তিনটির যখন আমি নাম রাখি, তখন প্রতিবারেই তুমি হেসেছিলে। তুমি যে কেন হাসতে, আমি বুঝতে পারি নি। আমার ইচ্ছা, তুমিই এবার ছোট ছেলের নাম রাখ। আর তোমার কাছে আমার একটি বিশেষ অনুরোধ আছে। তোমার শিক্ষায় তিনটি ছেলেই সংসার-ত্যাগী হয়ে চলে গেল। এ ছেলেটিকে তুমি ত্যাগের ধর্ম শিক্ষা দিও না, সংসার-ধর্ম শিক্ষা দাও।

রানী উত্তর করলেন, মহারাজ, আমি আপনার আদেশ নিশ্চয় পালন করব। আত্মার কোন নাম হতে পারে না। বিক্রান্ত, সুবাহু, অরিন্দম প্রভৃতি নাম আত্মাকে দেওয়া যায় না। এ জন্যই আমি হেসেছিলুম। আপনি যখন বলছেন, তখন এ ছেলের নাম আমিই রাখব, আর আমার যথাসাধ্য আমি তাকে সংসারধর্ম শিক্ষা দেব।

রানী ছোট ছেলের নাম রাখলেন অলর্ক। অলর্ক কথার এক মানে হয় পাগলা কুকুর। অলর্ক ধীরে ধীরে বড় হতে লাগল। রানী তাকে পরম যত্নে নানাপ্রকার বিদ্যা, গৃহস্থের কর্ম, রাজার ধর্ম সব শিক্ষা দিতে লাগলেন। রানীর শিক্ষায় অল্পদিনের মধ্যেই অলর্ক নানাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠল। তার গুণ ও বিদ্যা দেখে সকলেই একবাক্যে প্রশংসা করতে লাগল।

অলর্ক যখন উপযুক্ত হ'ল, রাজা ঋতধ্বজ তখন তার উপর রাজ্যের ভার দিয়ে তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন। রাজার সঙ্গে মদালসাও বনে গেলেন। বিদায় নেবার সময় রানী অলর্কের হাতে একটি আঙটি পরিয়ে দিয়ে বললেন, বাবা, সংসারধর্ম বড় দুঃখের, রাজার ধর্ম বড় কঠিন। যদি কোন দিন তোমার মনে অসহ্য দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহলে এ আঙটিটি খুলে দেখো, তার ভিতর তোমার জন্য আমি একটি বস্তু রেখে যাচ্ছি।

অলর্ক সজল নয়নে মার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে তাঁকে বিদায় দিলে।

রাজা হয়ে অলর্ক প্রজা পালন করতে লাগলেন। নূতন রাজার শাসনে প্রজাগণ পরম সুখে বাস করতে লাগল। প্রজাদের আনন্দ দেখে রাজার মনেও আনন্দের সীমা ছিল না।

বহুদিন পর, কি কারণে অলর্ক মনে বড় দুঃখ পেলেন। তখন মার কথা তাঁর মনে হল। হাতের আঙটি খুলে তিনি দেখলেন, তার ভিতর একটি সরু কাগজে খুব সরু সরু অক্ষরে উপদেশ লেখা আছে। সে-সব পাঠ করে অলর্ক মনে বড় শান্তি ও বল পেলেন। তিনি অন্যের উপর রাজ্যের ভার দিয়ে দত্তাত্রেয় ঋষির আশ্রমে ধর্ম শিক্ষা করতে চলে গেলেন।

মদালসা তাঁর ছেলেদের কাছে যে-সব অমূল্য উপদেশ দিয়ে গেছেন, সে-সব বিস্তারিত ভাবে পুরাণে লেখা আছে।

সেগুলো হিন্দুসন্তানদের কাছে চির আদরের হয়ে আছে ও থাকবে। ধন্য মদালসা, আর ধন্য সে দেশ, যে দেশের ছেলেরা মদালসার মত মার কোলে জন্ম গ্রহণ করে এবং মানবজীবনের সর্বাপেক্ষা মহৎ শিক্ষা পায়!

তিন বর

স্বামিজী এমেরিকা'র থাউজেণ্ড আয়লেণ্ড পার্কে তাঁর শিষ্যদের কাছে উপদেশচ্ছলে এ গল্পটির বিষয় বলেছিলেন। এটি দেববাণী পুস্তকে আছে।

এক গ্রামে একটি লোক ছিল বড় গরিব। তার নাম বিশু। ছেলে বয়স থেকে বিশু ছিল একটু বোকা ও বেশ একটু একগুঁয়ে। কিন্তু সে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করত। বিশুর সংসারে এক বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

বিশু সারাদিন পরিশ্রম করে যা দু চার পয়সা আনত, বিশুর মা তাতেই কোনরকম সংসার চালিয়ে নিত। বিশুর একটা মস্ত গুণ ছিল, সর্বদাই সে বেশ আনন্দে থাকত আর অতি সুন্দর গল্প বলতে পারত। এজন্য পাড়ার লোক সকলেই তাকে খুব আদর করত।

কিছুদিন পর বিশুর মা গেলেন মারা। বিশু কদিন কাজে গেল না, পাড়াতে গল্প করতে বা বেড়াতে গেল না, ঘরে বসে শুধু কাঁদল। কিছুদিন পর বিশুকে কাজে বেরুতে হল। তার কিছুদিন পর তার মুখে মাঝে মাঝে হাসি দেখা গেল। আরো কিছুদিন পরে সে আবার আগের মত বেড়াতে গল্প করতে পাড়ায় যেতে লাগল।

কিন্তু মাঝে মাঝে বিশুর মনটা বড় খারাপ হয়ে উঠত। সংসারে আর একটি প্রাণী নেই। বাড়ি ঘরই বা দেখে কে, দুবেলা দুমুঠো রান্নাই বা করে দেয় কে? পাড়ার কানুর মা

একদিন বললেন, বিশু ঠাকুরপো, আর কদিন এভাবে সন্নিসি হয়ে থাকবে? কদিন বা নিজের হাতে এভাবে হাঁড়ি ঠেলবে? আমরা সকলে চেয়ে চিন্তে একটি রাঙা টুকটুকে বউ এনে দি, তুমি বিয়ে কর।

অনেক বলার পর অনেক অনুরোধের পর বিশু বিয়ে করতে রাজি হল। অনেক সম্বন্ধ আসল কিন্তু একটাও বিশুর পছন্দ হল না। বিশুর নাক ছিল খাঁদা। সে ভাবলে, যদি খুব সুন্দর দেখে বউ আনি, তবে সে আমার খাঁদা নাক দেখে হাসবে, আমায় ঘেন্না করবে। তাই অনেক দেখে শুনে একটু বেশী বয়সের ও তার মত খাঁদানাকের একটি মেয়েকে সে বিয়ে করে আনলে। দুজনের নাকই খাঁদা, তাই কেউ কাউকে ঘেন্না করত না। কদিন যেতে না যেতেই বউ সংসারের কাজকর্ম সব দেখে শুনে নিলে। আবার নিশ্চিন্ত হয়ে বিশু কাজে বেরুতে লাগল।

কিন্তু আর এক বিপদ হল। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা বলতে আরম্ভ করলে,

বিশুর যেমন খাঁদা নাক, বউএর তেমনি ধারা,
অতি সেয়ান বিশু তোমার মাথায় গোবর ভরা।

শুনে ছোটরা সব হাততালি দিয়ে হাসত। বড়রা গালাগাল দিয়ে বলতেন, ছি, এসব কথা মুখে আনতে নেই। এই বলে মুখ ফিরিয়ে তাঁরাও হাসতেন।

বিশুবউ এসব দেখত আর মনের দুঃখে তার দু চোখে জল আসত। নিত্য কত সওয়া যায়! একদিন বউ সব কথা

বিশুর কাছে বলে দিলে। বিশু বললে, আচ্ছা রাখ, একটা বিহিত আমি করছি।

পরদিন সকালে বিশু সারা পাড়া ঘুরে এল। সে যেখানেই যে ছেলেকে দেখলে তাকেই শাসিয়ে বললে, তোমরা যদি আমার বউএর নামে ছড়া কাটবে তাহলে আমি কাউকে আস্ত রাখব না, বলে দিচ্ছি।

সময় মত বিশু তার কাজে বেরিয়ে গেল। বিশুর কথায় লাভ হল এই, আগে মাত্র দুএকটি দুষ্ট ছেলে ছড়া কাটত, সেদিন ছোট বড় ভাল মন্দ সব ছেলেই বলতে লাগল,—

বিশুর যেমন খাঁদা নাক···

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বিশু তার পরিবারের মুখে সব শুনলে। তার মনে ভারি দুঃখ হল। ভগবান তাদের নাক খাঁদা করে দিয়েছেন, এতে তাদের কি দোষ? অনেক ভেবে চিন্তে সে তার বউকে বললে—আমার এক বন্ধুর বিয়ে, আজ রাত্রেই আমাকে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি আমায় রান্না করে দাও। ফিরতে আমার দুচার দিন দেরি হতে পারে। খুব সাবধানে থেকো।

সকাল সকাল দুটি খেয়ে বিশু বেরিয়ে পড়ল। বিশুর কোন বন্ধুর বিয়েও নয় আর সে কোন বন্ধুর বাড়িও গেল না। তার বাড়ি থেকে অনেকখানি দূরে ছিল একটা গভীর বন। সে-রাত্রেই সে সেই গভীর বনে চলে গেল। তারপর এক পাথরের উপর বসে একমনে শিবকে ডাকতে লাগল।

প্রথম দিন গেল, দ্বিতীয় দিন গেল, তৃতীয় দিন গেল। বিশু আহার নিদ্রা সব ভুলে খুব একমনে শিবকে ডাকতে লাগল। কত সাপ তার গায়ের উপর দিয়ে চলে গেল, কত বাঘ তার কাছ দিয়ে ডেকে গেল, কত ভালুক এসে তার গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে গেল। বিশু একটুও ভয় পেলে না, একবার ফিরেও চাইলে না। তার কঠিন পণ, হয় সে শিবকে আনবে, নয় প্রাণ দেবে।

বিশুর কঠোর তপস্যা কিছুতেই ভঙ্গ হয় না। দেখতে না দেখতে আকাশ ভেঙে জলঝড় এল, হাজার হাজার বাজ পড়ল, কত শিলাবৃষ্টি হল, বিশু কিছুই খেয়াল করলে না। সে শুধু একমনে শিবকে ডাকতে লাগল।

ধীরে ধীরে জলঝড় সব কেটে গেল, আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ হেসে উঠল। জুঁই মালতি বেলি চামেলির গন্ধে বন ভরে উঠল। ঘুমন্ত কোকিল পাপিয়া দোয়েল আধ স্বরে ডেকে উঠল। বিশুর তাতেও কোন খেয়াল নেই। সে শুধু একমনে শিবকে ডাকতে লাগল।

তারপর যেন স্বর্গে শত শত দেবকন্যা গান ধরলে। তাদের বীণার সুরে নাচের তালে নূপুরের ঝঙ্কারে সারা বন কেঁপে উঠল। বিশুর প্রাণও যেন দুলে উঠল। কিন্তু সে আবার মন ঠিক করে বসল। শিবকে না এনে সে কিছুতেই উঠবে না।

দেবতাদের মধ্যে শিবের অন্তর বড় নরম। কেউ ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না, এসে

দেখা দেন আর ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। সহজে তুষ্ট হন বলেই শিবের এক নাম আশুতোষ।

তৃতীয় দিন রাত্রি-শেষে শিব এসে দেখা দিয়ে বললেন, বাছা, তোমার ভক্তিতে আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর লও।

বিশু তার দুঃখের কাহিনী শিবের কাছে সব বললে। তখন শিব তিনটি পাশা বিশুর হাতে দিয়ে বললেন, এই পাশাগুলো নাও। এগুলো মাটিতে ফেলে তুমি যে বর চাইবে, তাই পাবে। এভাবে তিনবার করো। তিনবারের বেশী আর পাবে না।

এই বলে শিব তিনটি পাশা বিশুর হাতে দিয়ে চলে গেলেন। বিশুর তখন কি আনন্দ! পাশাগুলো খুব যত্ন করে কাপড়ে বেঁধে সে একেবারে বাড়ি এসে হাজির। বিশুবউ তখন উঠান ঝাঁট দিচ্ছিল। বিশু বললে, ওগো এস, আর ঝাঁট দিতে হবে না। হাত পা ধুয়ে শিগগির এস। আমাদের সব দুঃখ শেষ করে এসেছি।

বিশুর মুখে হাসি আর ধরে না। বিশুর রকম দেখে বউ একেবারে অবাক, মানুষটা পাগল হয়ে গেল না তো? বউ বললে, কি হয়েছে গো, বলই না?

—বলব, বলব, শিগগির এস, শিগগির এস, আমাদের সব হয়ে গেছে, আমাদের সব দুঃখ গেছে।

—কি আমাদের সব হয়েছে গো, আমাদের সব দুঃখ কি করে গেল গো? তুমি কোথায় গিয়ে কি করে এলে গো? কি সর্বনাশ আমার হল গো।

বিশুর কথা শুনে আর কাণ্ড কারখানা দেখে বউ ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেল। সে মনে করলে নিশ্চয়ই বিশু ক্ষেপেছে। ভয়ে দুঃখে বউ একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললে।

পাগল নাকি? মেয়ে মানুষের মাথায় যদি একটুও বুদ্ধি থাকে। নইলে আর ভগবান মেয়েমানুষ করেছে কেন? হয়েছে, আর কাঁদতে হবে না, এস—এই বলে বিশু তার বউকে টেনে একেবারে দাওয়ায় এনে বসালে। তারপর কাপড়ের ভিতর থেকে পাশাগুলো বের করে তার কাহিনী

আগাগোড়া বললে। বউএর কান্না আগেই থেমে গিয়েছিল, এবার মুখে হাসি দেখা দিলে।

তিনটি বর চাইতে হবে। কি কি চাওয়া যায়? দুজনে পরামর্শ আরম্ভ হল। বউ বললে, দেখ, আমরা বড় গরিব, প্রথম বরে টাকা পয়সা চাও।

বিশু ঘাড় নেড়ে বললে, না গো না, খাঁদা নাকের জন্য আমাদের এত নিন্দে এত দুঃখ, আগে খুব সুন্দর নাক চাইব।

অনেকক্ষণ ধরে যুক্তি পরামর্শ চলল, কিন্তু দুজনে কিছুতেই একমত হতে পারলে না। বউ বলে টাকা চাও, বিশু বলে নাক চাই।

শেষ কালে দুজনে ঝগড়া। তখন বিশু খুব চটে গিয়ে পাশাগুলো মাটিতে ফেলে বললে, আমাদের দুজনের খুব সুন্দর সুন্দর নাক হক।

দেখতে না দেখতে বউএর আর বিশুর সারা গা-ময় শত শত সুন্দর সুন্দর নাক গজিয়ে উঠল। বিশুবউ রাগে দুঃখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

বিশুর বিশ্বাস, সে বড় বুদ্ধিমান। সে বউকে বললে, আরে, ভয় পাচ্ছ কেন? দেখ না, এবারই সব ঠিক হয়ে যাবে।

সে আবার মাটিতে পাশা ফেলে বললে, আমাদের সব নাক চলে যাক।

অমনি সব নাক চলে গেল। কিন্তু আর এক বিপদ হল। তাদের আগেকার যে দুটি নাক ছিল, সে দুটিও সকলের সঙ্গে চলে গেল। খাঁদা হলেও আগে

তবু নাক ছিল, এবার তাও গেল। বিশুবউর কান্না আর থামল না।

বিশুও মহা বিপদে পড়ে গেল। একটি বর মাত্র বাকি। সে বরে কি চাওয়া যায়? বিশু মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ভাবলে। এই শেষ বার তাদের একটা করে সুন্দর নাক হতে পারে সত্যি, কিন্তু তাতেও বিপদ আছে। তাদের সুন্দর নাক দেখে সকলেই জিজ্ঞেস করবে। কালে সবই জানাজানি হয়ে যাবে। তখন সকলেই ভাববে, বিশু কি বোকা। তিন তিনটে বর পেয়েও নিজের কোন উন্নতি করতে পারলে না।

বিশু তখন পাশাগুলো আবার মাটিতে ফেলে বললে, আমাদের যেমন খাঁদা নাক আগে ছিল তেমনি দুজনের দুটি নাক হক।

শিবের বরে তাই হল। বোকা বিশু তিন তিনটে বর পেয়েও কিছুই লাভ করতে পারলে না।

কিছুই গোপন থাকে না। বিশুর সাধনার কথা, তিন বরের কথা, নাকের কথা ধীরে ধীরে পাড়াময় জানাজানি হয়ে গেল। তখন দুষ্ট ছেলেরা আগে বেশী করে বলতে লাগল,

বিশুর যেমন খাঁদা নাক, বউএর তেমনি ধারা,
অতি শেয়ান বিশু তোমার মাথায় গোবর ভরা।

কেউ ছোট নয়

কাজ করাই মানুষের স্বভাব। কাজ ছাড়া কেউ থাকতে পারে না। কাজের দ্বারাই মানুষ মহৎ হয়, আবার কাজের দ্বারাই মানুষ অসৎ হয়। আবার এই কাজের দ্বারাই মানুষ ভগবানকে পায় বা ভগবানের মত হতে পারে। কাজের নাম কর্ম। যে ভাবে কর্ম করলে মানুষ ভগবানকে পায় বা ভগবানের মত হয়, তার নাম কর্মযোগ। স্বামী বিবেকানন্দ কর্মযোগ সম্বন্ধে এমেরিকাতে অনেকগুলো বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেইগুলো একত্র করে "কর্মযোগ" পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এ গল্পটি কর্মযোগে আছে।

সে অনেক দিনের কথা। এদেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম বিশ্বধর। তিনি ছিলেন বড় ধার্মিক। অন্তরের সহিত তিনি যা বিশ্বাস করতেন, কাজেও তাই করতেন। রাজা অনেক ধর্মপুস্তক পড়েছিলেন। সেই সব পড়ে তাঁর মনে হল, সংসারে থেকে সংসারের সব কর্তব্য যে ঠিক ঠিক পালন করে, সেই বড়। সংসার ত্যাগ করে যে সন্ন্যাসী হয়, সে বড় নয়।

সেকালে বহু সন্ন্যাসী রাজাকে দর্শন করতে মাঝে মাঝে রাজসভায় যেতেন। কারণ রাজদর্শন বড় পুণ্যের। রাজা বিশ্বধরকে দর্শন করতেও বহু সন্ন্যাসী তাঁর রাজসভায় যেতেন। তাঁদের সকলকে তিনি প্রশ্ন করতেন, গৃহী বড় না সন্ন্যাসী বড়?

তাঁরা রাজাকে কিছুতেই বোঝাতে পারতেন না যে, গৃহীর চেয়ে সন্ন্যাসী বড়। তখন রাজা জোর করে তাঁদের বিয়ে দিয়ে গৃহস্থধর্ম পালন করতে আদেশ করতেন।

কিছুদিন পর একজন সন্ন্যাসী বিশ্বধরের রাজসভায় গেলেন। সন্ন্যাসীর নাম কল্যাণক। রাজা প্রশ্ন করলেন, গৃহী বড় না সন্ন্যাসী বড় ?

গম্ভীর ভাবে সন্ন্যাসী উত্তর করলেন, দুইই বড়।

অবাক হয়ে বিশ্বধর আবার প্রশ্ন করলেন, সে কি রকম ?

কল্যাণক বললেন, মহারাজ, গৃহস্থের চেয়ে সন্ন্যাসী বড় নয়, আবার সন্ন্যাসীর চেয়ে গৃহীও বড় নয়। যে গৃহী তাঁর ধর্ম ঠিক ঠিক পালন করেন আর যে সন্ন্যাসী তাঁর ধর্ম ঠিক ঠিক পালন করেন, তাঁরা উভয়েই সমান।

রাজা আবার প্রশ্ন করলেন, আপনার কথা যে সত্য আমি তা কি করে জানব ? আপনাকে তার প্রমাণ দিতে হবে। যদি প্রমাণ দিতে না পারেন তবে সন্ন্যাস ধর্ম ত্যাগ করে আপনাকে সংসারী হতে হবে।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে উত্তর করলেন, প্রমাণ আমি নিশ্চয়ই দিতে পারি রাজা। কিন্তু প্রমাণ নিতে হলে আপনাকেও একটু কষ্ট স্বীকার করতে হবে।

রাজা আগ্রহে উত্তর করলেন, কি কষ্ট ?

কল্যাণক বললেন, কষ্ট আর কিছুই নয়, আপনাকে কিছু-দিন আমার সঙ্গে ছদ্মবেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হবে। পারবেন রাজা ?

রাজা রাজি হলেন।

সন্ন্যাসী বড় না গৃহী বড়, একটি মস্ত বড় প্রশ্ন। এ প্রশ্ন এদেশে বহুকাল হতে চলে আসছে। কেউ বলেন,

সন্ন্যাসী বড়, আবার কেউ বলেন, গৃহস্থ বড়। এর আর মীমাংসা হয় না। বিশ্বধরের মনেও এ প্রশ্ন উঠেছিল। যথার্থ সত্য কি, একথা জানবার জন্য দেশভ্রমণ কেন, যে কোন কঠিন কাজ করতেও রাজা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি রাজ্যের ভার মন্ত্রীর উপর দিয়ে রাজপোশাক পরিত্যাগ করে ছদ্মবেশে কল্যাণকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

কল্যাণক চললেন, পেছনে চললেন রাজা বিশ্বধর। যেতে যেতে দুজনের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গেল। কল্যাণক কত তীর্থের, কত দেশ-বিদেশের গল্প, কত সাধু-সন্ন্যাসীর কথা, কত শাস্ত্র-পুরাণের কাহিনী বলতেন, তাতে রাজার দিন আনন্দে কোন্ দিক দিয়ে কেটে যেত। পথচলার কষ্ট রাজার গায়েও লাগত না, মনেও আসত না। গ্রামের পথে কল্যাণক ভিক্ষে করে আনতেন আর দুজনে মনের আনন্দে ভাগ করে খেতেন। এভাবে দিন বেশ কেটে যেত, পথও শেষ হত।

রাজা মাঝে মাঝে ভাবতেন, সংসারে মানুষের কত কষ্ট! প্রাণপাত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা আনতে হয়, স্ত্রীপুত্র পরিবার পালন করতে হয়, নিত্য আহারের কথা ভাবতে হয়, আহারের আয়োজন করতে হয়, আহার তৈরী করতে হয়, ঘরবাড়ি জমিজমা বিষয় সম্পত্তি দেখতে হয়, ছেলের অসুখ, মেয়ের বিয়ে, তার উপর চোর ডাকাত মামলা মকদ্দমা বিপদ আপদ কত কি। সন্ন্যাসীদের এসব হাঙ্গামা কিছুই নেই। তপস্যায় ধর্মকথায় তাঁদের দিন কত আনন্দে কেটে যায়। খাবার থাকবার তাঁদের ভাবনা নেই। মানও তাঁরা চান না,

আধার অপমানও তাঁদের নেই। বাস্তবিকই সন্ন্যাসীদের জীবন বড় সুখের।

বিশ্বধর আবার ভাবতেন, না, নিজের সুখের জন্য যারা সংসার ত্যাগ করে আসে, তারা তো মহা স্বার্থপর। যারা দুঃখের ভয়ে মাতাপিতা পরিজন পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায়, তারা তো কাপুরুষ। না, হক সংসার দুঃখের, মহা-দুঃখের, যারা এ দুঃখরাজি বরণ করে সংসারে থাকে, তারাই শ্রেষ্ঠ, তারাই বীর।

রাজা মনে মনে এসব ভাবনা বিচার করলেও বাইরে কিন্তু কল্যাণককে কিছু বলতেন না।

কল্যাণক ও বিশ্বধর চললেন। যেতে যেতে তাঁরা আর এক রাজার রাজ্যে এসে পড়লেন। তাঁরা দেখলেন, দূরে একদল লোক ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়ে আসছে আর কি যেন চীৎকার করে বলছে। দেখতে দেখতে তারা কাছে এসে

পড়ল। তারা ঢাক বাজিয়ে বললে, রাজবাড়িতে রাজকুমারী আরুণিকার স্বয়ম্বর হবে আসছে পূর্ণিমায়।

ঢাকিরা সব চলে গেল। কল্যাণক বললেন, রাজা, চলুন রাজকুমারীর স্বয়ম্বর দেখে আসা যাক।

বিশ্বধর বললেন, তাই চলুন।

রাজা ও সন্ন্যাসী হেঁটে হেঁটে ঠিক পূর্ণিমাদিন সকাল বেলা রাজবাড়িতে উপস্থিত হলেন। তাঁরা দেখলেন, নানা রঙের ফুল পাতা মালা পতাকা দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় শত শত তোরণে তোরণে মঙ্গল কলস শোভা পাচ্ছে। সানাই বাঁশী রসনচৌকি ঢাক ঢোল কাড়া নাকাড়া শিঙা ভেরি কত কি বাজছে। সারি সারি ঘোড়া হাতি সেপাই সান্ত্রী দাঁড়িয়ে।

দেখতে দেখতে কল্যাণক ও বিশ্বধর রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। নানাদেশের নানারাজ্যের রাজপুত্রেরা রাজসভা আলো করে বসেছিলেন। তাঁদের বেশভূষার জাঁক-জমকে অলংকারের চাকচিক্যে রাজসভা অপূর্ব শোভা ধারণ করেছিল। সিংহাসনে রাজা বসেছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা আরুণিকার স্বয়ম্বর।

একটু পরেই অন্তঃপুর হতে মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠল। ধীরে ধীরে রাজকুমারী সভায় প্রবেশ করলেন, সঙ্গে সখীগণ। হাতে তাদের বরণডালা বরের মালা আর মঙ্গল শঙ্খ। তাদের দেখে মনে হল, যেন পরীরানী পরীদের সাথে ইন্দ্রের সভায় প্রবেশ করলেন। বন্দীরা মধুর কণ্ঠে গাইলে বন্দনাগান, পুরোহিত করলেন বেদমন্ত্র পাঠ। তারপর রাজা ধীরে ধীরে

উঠে অতি গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ আদিত্য অগ্নি বেদ ও ব্রাহ্মণকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার একমাত্র দুহিতা কুমারী আরুণিকা আজ যাকে বরমাল্য দান করবে, তার হাতেই আমি কুমারীকে সম্প্রদান করব।

সখীরা উলুধ্বনি করলে। রাজসভার সকলের চোখ এক সঙ্গে আরুণিকার উপর পড়ল, কার ভাগ্যে যে আজ বরমাল্য আছে।

ধীরে ধীরে রাজকুমারী চলতে আরম্ভ করলেন। রাজপুত্রদের বুক দুর্ দুর্ করতে লাগল, না জানি কাকে রাজকুমারীর ভাল লাগে। রাজপুত্রদের সামনে দিয়ে রাজকুমারী হেঁটে চললেন। যে সব রাজপুত্রদের ফেলে আরুণিকা চলে গেলেন, তাঁদের মুখ একেবারে কালো হয়ে গেল আর তাঁরা লজ্জায় দুঃখে মাথা হেঁট করলেন। একে একে সকল রাজপুত্রের সামনে দিয়ে কুমারী চলে গেলেন, কাউকে তাঁর মনে লাগল না।

এক এক কুমারীর মনের ভাব এক এক রকম। কেউ খুব বিদ্বান বর চান, কেউ চান ধনী, কেউ চান মানী, কেউ চান বীর, কেউ চান ধার্মিক, কেউ আবার চান বর যেন দেখতে খুব সুন্দর হয়। আরুণিকার মনের ইচ্ছা, তাঁর বর দেখতে কার্তিকের মত সুন্দর হন।

আগে আরো দুবার আরুণিকার স্বয়ম্বর সভা হয়েছিল। কিন্তু কাউকে আরুণিকার মনে ধরে নি। রাজা সেবার অনেক চেষ্টা করে খুব বড় সভার আয়োজন করেছিলেন। অনেক দূর দেশ দেশান্তর থেকে রাজপুত্রেরা আরুণিকাকে পাবার জন্য

এসেছিলেন। আরুণিকার মত সুন্দরী মেয়ে সারা দেশে আর ছিল না। তাই সারা দেশ জুড়ে আরুণিকার ছিল নাম। আরুণিকা কোন রাজপুত্রের গলায়ই মালা দিলেন না। রাজা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একটা বিষাদের কালো ছায়া সমস্ত রাজসভাকে যেন ঢেকে ফেললে।

হঠাৎ সকলে চেয়ে দেখলেন, রাজসভার এক কোণে এক যুবক সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কি রূপ! যেন প্রভাতী সূর্যের উদয় হয়েছে। সকলে অবাক হয়ে দেখলেন, রাজ-কুমারী তাঁর দিকেই যেন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। আরুণিকা তাঁর গলায়ই মালা পরিয়ে দিলেন। সখীদের হাতে শাঁক বেজে উঠল। দিকে দিকে অমনি কাড়া নাকাড়া তুরি ভেরি সানাই বাঁশী সব বেজে উঠল।

সন্ন্যাসী স্বপ্নেও ভাবেন নি, তাঁর গলায় কুমারী কখনো মালা পরিয়ে দেবেন। তিনি রাজকুমারীকে মালা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, ভুল করলে কুমারী, আমি যে সন্ন্যাসী।

রাজা ভাবলেন, সন্ন্যাসীর কোন ধন সম্পত্তি নেই বলেই রাজকন্যাকে বিবাহ করতে চাইছেন না। তিনি বললেন, রাজকুমারীকে গ্রহণ করতে তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই বাবা। আরুণিকা আমার একমাত্র সন্তান। আমার মৃত্যুর পর আমার এ বিশাল রাজ্যের তুমিই হবে অধিকারী। এখন আরুণিকার সঙ্গে আমি তোমাকে অর্ধেক রাজ্য দান করব।

বাবার কথায় সাহস পেয়ে আরুণিকা আবার তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী তখন তাড়াতাড়ি মালাটি

ছিঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে রাজসভা ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর রূপে আরুণিকা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, হয় আমি তাঁকে লাভ করব, নয় প্রাণ দেব।

এই বলে তিনিও সন্ন্যাসীর পিছু পিছু ছুটে বেরিয়ে গেলেন। কল্যাণক ও বিশ্বধর সভার আর এক পাশে দাঁড়িয়ে সবই দেখছিলেন। কল্যাণক বললেন, রাজা চলুন, আমরাও এঁদের সঙ্গে যাই।

তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

এত তাড়াতাড়ি এইসব কাণ্ড হয়ে গেল যে, রাজা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন, কি যে করবেন ভেবে পেলেন না। এভাবে যে একটা ঘটনা ঘটতে পারে, কেউ তা ভাবতেও পারে নি। একটু পরে রাজার জ্ঞান ফিরে এল। তিনি কুমারীর জন্য লোকজন সেপাই সব পাঠালেন। ততক্ষণ সন্ন্যাসী ও কুমারী অনেক দূর চলে গেলেন।

সন্ন্যাসী কিছুতেই বিয়ে করবেন না। কুমারী যখন তাঁকে মনোনীত করেছেন তখন রাজা জোর করেই তাঁর বিয়ে দেবেন, এই ভয়ে সন্ন্যাসী প্রাণপণে ছুটে পালাচ্ছিলেন। যাঁকে একবার পতি স্বীকার করে মালা দিয়েছেন, যেমন করেই হক তাঁকে পেতেই হবে, এই ভেবে আরুণিকাও প্রাণপণে ছুটছিলেন। রাজকুমারী, জন্ম থেকেই যিনি সুখের মধ্যে লালিত পালিত, মাটিতে যাঁর কোন দিন পা পড়ে নি, তিনি একজন পুরুষের সঙ্গে ছুটে পারবেন কেন? ক্রমশই তিনি পেছিয়ে পড়তে লাগলেন।

সন্ন্যাসী বনের পথ ধরলেন। কারণ, বনের মাঝে পালানো সহজ। পেছনে আরুণিকা আর তাঁর পেছনে কল্যাণক ও বিশ্বধর। কিছুক্ষণ পর সন্ন্যাসীকে আর দেখা গেল না। বনের মধ্যে কোথায় তিনি লুকিয়ে গেলেন। বনের পথ সন্ন্যাসীর সবই জানা। তাই তিনি সহজেই গা-ঢাকা দিলেন। তাঁকে আর দেখতে না পেয়ে আরুণিকা চারদিক খুঁজতে লাগলেন। কোথাও না দেখে শেষকালে হতাশ হয়ে এক গাছের নীচে বসে পড়লেন আর মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলেন। সন্ধ্যা তখন হয় হয়, রাজকুমারীর সাধ্য নেই পথ চিনে বন থেকে বেরিয়ে আসেন।

কল্যাণক ও বিশ্বধরও ততক্ষণে আরুণিকার কাছে এসে পৌঁছলেন। রাজকুমারীর অবস্থা দেখে তাঁদের মনে বড় দয়া হল। কল্যাণক বললেন, মা, তোমার কোন ভয় নেই। এদেশের পথঘাট আমরা জানি নে, আমরা বিদেশী। এ অন্ধকারের মধ্যে পথ চিনে বনের বাইরে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, নিরাপদও নয়। তুমি নির্ভয়ে রাতটি এখানে থাক। আমরা দুজনে তোমাকে রক্ষা করব। কাল সকালে আমরা তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌঁছে দেব।

কত যে কাঁটা আরুণিকার পায় বিঁধেছিল, পা ও গা কেটে কত যে রক্ত ঝরছিল। খানিক পরে ক্লান্তিতে অবসাদে দুঃখে তিনি মাটির উপর শুয়ে পড়লেন। বিশ্বধর চুপ করে বসে স্বয়ম্বরের কথা সব ভাবছিলেন। কল্যাণক মধুর সুরে গান ধরলেন, “ভজ মন রাম-চরণ দিনরাতি”।

বিশ্বধর ভাবছিলেন, কেন সন্ন্যাসী রাজকন্যাকে বিয়ে করলেন না? রাজকন্যার সাথে অর্ধেক রাজ্য তিনি পেতেন। রাজার সমস্ত রাজ্যটাই তো হত তাঁর। পরমাসুন্দরী রাজকন্যা। সন্ন্যাসীও খুব স্বাস্থ্যবান, রূপবান। তাঁর তেজোময় মুখ দেখে তো মনে হয় না, তিনি দুঃখের ভয়ে সংসার থেকে পালিয়ে এসেছেন। সংসারে যে অবস্থাকে লোকে সব চেয়ে সুখের মনে করে,—সুন্দরী রাজকন্যা, বিশাল রাজত্ব—সব হাতের মধ্যে পেয়েও কেন তিনি সে-সব ত্যাগ করলেন?

কল্যাণক বললেন, রাজা, আমি ছেলেবয়সে পাখি বড় ভালবাসতুম। খুব মন দিয়ে আমি সব সময় পাখির ডাক শুনতুম। আট দশ বছর শুনে শুনে আমি পাখির ভাষা শিখে ফেলেছিলুন। পাখিরা যে ডাকে, তার অর্থ আছে। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। মানুষ তাদের কথা বুঝতে পারে না, তাই মনে করে এগুলোর কোন অর্থ নেই। অবশ্য পাখিদের খুব বেশী কথা নেই। অল্প কটি শব্দ দিয়েই তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে। আমরা যে-গাছের নীচে বসেছি, তার ডালে একটি পাখির বাসা আছে। বাসায় বুড়ো বুড়ী আর তাদের দুটি বাচ্চা আছে। বুড়ো বুড়ীর মধ্যে কথা হচ্ছিল। সে-সব বড় অদ্ভুত কথা। শুনলে আপনি আশ্চর্য না হয়ে পারবেন না।

বিশ্বধর পাখির কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। কল্যাণক বলতে লাগলেন, তাদের কথাগুলো বাংলা করে আমি আপনাকে বলছি। বুড়ীকে বুড়ো বললে, ওগো শুনছ?

—কি ? বুড়ী উত্তর করলে।

—একবার নীচের দিকে দেখ না ?

—দেখছি।

—কি দেখছ ?

—তিনটি অতিথি আমাদের বাড়ি এসেছে।

—হ্যাঁ, কিন্তু কি হবে বল দেখি ?

—তাই তো ভাবছি, এই শীতের রাত, শীতে তাঁদের যে বড় কষ্ট হচ্ছে।

—আমরা গৃহস্থ। গৃহস্থের কাছে অতিথি যে নারায়ণ। তুমি একটু আগুনের চেষ্টা দেখ না ?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আমি চেষ্টা করে দেখি, একটু আগুন এনে অতিথি-নারায়ণদের দিতে পারি কিনা। তুমি বাচ্চাদের দেখো।

কল্যাণক বলতে লাগলেন, তারপর আমি ডানার শব্দ শুনতে পেলুম। মনে হচ্ছে, পুরুষ পাখিটি আমাদের জন্য আগুন আনতে গেল।

কল্যাণকের কথা শেষ হতে না হতেই গাছ থেকে এক টুকরো শুকনো কাঠ তাঁদের সামনে পড়ল। কাঠের একদিকে আগুন জ্বলছিল। ব্যাপার দেখে বিশ্বধর একেবারে অবাক! কল্যাণক যে সত্যি কথা বলছেন, তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। কল্যাণক তাড়াতাড়ি কতকগুলো শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে আনলেন। তাতে আগুন করে সকলে শীতের রাত্রে বেশ আরাম অনুভব করলেন।

একটু পরেই হঠাৎ কল্যাণক চীৎকার করে উঠলেন, ভগবান, পাখিটিকে বাঁচাও, বাঁচাও।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা পাখি গাছ থেকে আগুনের মধ্যে পড়ে গেল। কল্যাণক ও রাজা তাকে আগুন থেকে উঠিয়ে আনলেন বটে, পাখিটা কিন্তু আর বাঁচলনা। তার পর আর একটা পাখি, তারপর তুটি বাচ্চাও একটির পর আর একটি আগুনে পড়ে মরে গেল। কল্যাণক বড় তুঃখ করতে লাগলেন। রাজা আরো আশ্চর্য হয়ে কল্যাণককে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি বলুন দেখি?
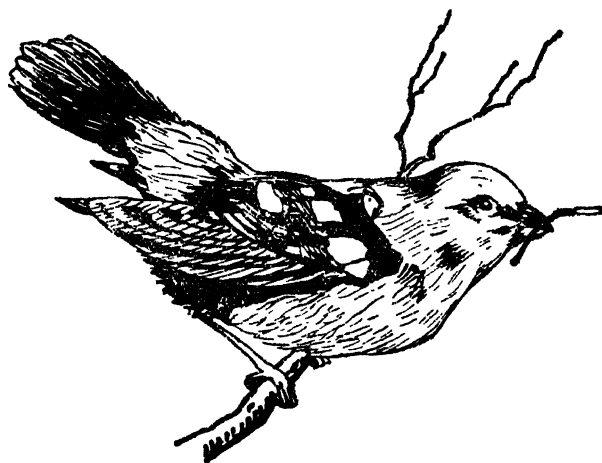
একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে কল্যাণক বলতে আরম্ভ করলেন, রাজা, আমি মনে করতুম সন্ন্যাসধর্ম ও গৃহস্থধর্ম তুইই সমান হলেও সংসার-ধর্মের চেয়ে সন্ন্যাস কঠিন। কিন্তু আজ চোখের সামনে দেখলুম, গৃহীদের ধর্মও কঠিন কম নয়।

রাজা, আপনি গৃহস্থ, পাখিদের ব্যাপার আমার চেয়েও আপনি ভাল বুঝতে পারবেন। আমাদের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করে দিয়েও পুরুষ পাখিটি তৃপ্তি লাভ করতে পারে নি। সে তার স্ত্রীকে বললে, দেখ আমাদের বাড়িতে অতিথি-নারায়ণরা আজ কিছু না খেয়ে থাকবেন, তা হতে পারে না। গৃহস্থের উচিত প্রাণ দিয়েও অতিথিদের সেবা করা। আমার শরীরটি আমি অতিথিদের সেবায় দেব। তুমি ছেলেদের দেখো।—এই বলে পাখি আগুনে ঝাঁপ দিলে। তখন স্ত্রী-পাখিটি তার বাচ্চাগুলোকে বললে, বাছা, তোমাদের বাবা অতিথিদের সেবায় নিজের প্রাণ দিলেন। অতিথি তিনজন, একটি পাখিতে তাঁদের কিছুই হবে না। স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর ধর্মে সাহায্য করা। আমিও যাচ্ছি। ভগবান আছেন, তিনি তোমাদের দেখবেন।—এই বলে বাচ্চাদের মাও আগুনে ঝাঁপ দিলে। তখন বাচ্চারা বলাবলি করতে লাগল, অতিথি তিনজন, দুটি পাখিতে তাঁদের কিছুই হবে না। ছেলেদের উচিত মা বাপের কাজে সাহায্য করা। এস, আমরাও আমাদের শরীর অতিথি সেবায় দিই।—এই বলে তারাও আগুনে ঝাঁপ দিলে। তারা ভেবেছিল, তাদের পুড়িয়ে আমরা মাংস খাব।

এসব ঘটনা দেখে আরুণিকাও কম অবাক হননি। সে-রাত্রে আর কারু ঘুম হল না। রাত্রি শেষে আরুণিকা কল্যাণককে বললেন, বাবা, তাঁকে যখন পেলুম না, তিনি যখন আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলেন, তখন আমি আর

এ জীবন রাখব না। আপনি আমায় অনুমতি দিন। আমিও পাখিদের মত জীবন ত্যাগ করি।

কল্যাণক বললেন, অমন কাজ করতে নেই মা। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁর গলায় মালা দেওয়াই তোমার ভুল হয়েছে। তার উপর আত্মহত্যা করে ভুলের বোঝা বাড়িওনা। পাখিরা ভুল করে নি। অতিথিসেবার আর কোন পথ না দেখে নিজেদের শরীর অতিথিদের আহারের জন্য দান করেছে। স্ত্রীর কর্তব্য সর্বদা স্বামীর ধর্মকর্মে সাহায্য করা। তাই স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্মিণী। যদি তুমি তাঁকে সত্যি সত্যি ভালবেসে থাক, তাঁকে পতিত্বে বরণ করে থাক, তাহলে তোমার উচিত তাঁকে সাহায্য করা, তাঁর অনিষ্ট করা নয়। তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে যাও, ধর্মভাবে জীবন যাপন করো, সাধ্যমত সকলের সেবা করো, আর দিনরাত ভগবানের কাছে তোমার পতির মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করো। তবেই বুঝব মা, তুমি ঠিক ঠিক কাজ করছ।

দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেল। পুব আকাশে প্রভাত-রবি বিচিত্র শোভা ধারণ করলে। আরুণিকাকে সাথে করে কল্যাণক ও বিশ্বধর তাঁর বাবার কাছে পৌঁছে দিলেন। আরুণিকার কাছে এবং তাঁর বাবার কাছে বিদায় নিয়ে তাঁরা বিশ্বধরের দেশের দিকে যাত্রা করলেন।

কল্যাণক বললেন, রাজা, ধর্মসাধনের দুটি পথ, গৃহ ও সন্ন্যাস। দুইই সমান। যথার্থ গৃহী ও যথার্থ সন্ন্যাসীতে

কোন তফাৎ নেই। মানুষ নিজের নিজের স্বভাব ও রুচি অনুসারে দুই পথে যায় মাত্র।

বিশ্বধর বললেন, আপনার দয়ায় আমি বাস্তবিকই বুঝতে পেরেছি, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী প্রত্যেকের স্থানে কেউ ছোট নয়।

কিছুদিন পর তাঁরা বিশ্বধরের রাজ্যের মধ্যে এসে পৌঁছলেন। সন্ন্যাসী কল্যাণক তখন রাজার কাছে বিদায় নিয়ে অন্য পথে যাত্রা করলেন। বিশ্বধর তাঁকে আবার রাজবাড়ি নিয়ে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কল্যাণক কিছুতেই রাজি হলেন না। তিনি হেসে বললেন, গৃহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে যদিও কেউ ছোট নয়, তবুও তাদের পথ এক নয় রাজা।

নচিকেতা

হিন্দুর সকল শাস্ত্র অপেক্ষা বেদ বড়। বেদের চার ভাগ, ঋক্ সাম যজু ও অথর্ব। বেদের সার ভাগের নাম বেদান্ত বা উপনিষদ। নচিকেতার গল্প যজুর্বেদের কঠোপনিষদে আছে। স্বামিজী এমেরিকার এক বক্তৃতাতে একদিন এ গল্পটি বলেছিলেন।

উদ্দালক নামে এক ঋষি ছিলেন। এক সময় তিনি এক বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করেন। সেই যজ্ঞের নাম বিশ্বজিৎ যজ্ঞ। যজ্ঞের শেষে দক্ষিণা দিতে হয়। তিনি যজ্ঞের দক্ষিণা-রূপে অসংখ্য গাভী ব্রাহ্মণগণকে দান করবার জন্য এনেছিলেন। তাছাড়া বহু ধন সম্পত্তিও তিনি দান করছিলেন।

উদ্দালকের একটি ছোট ছেলে ছিল। তাঁর নাম নচিকেতা। বালক হলেও নচিকেতা খুব বুদ্ধিমান ছিলেন এবং তাঁর অন্তরে ছিল খুব জ্ঞান। যজ্ঞ যখন আরম্ভ হয়, তখন যজ্ঞ দেখবার জন্য নচিকেতা যজ্ঞ-মণ্ডপে প্রবেশ করলেন। মস্ত বড় যজ্ঞকুণ্ড। কুণ্ডের চারপাশে অনেক ঋষি বসে যজ্ঞ করতে আরম্ভ করেছেন। ব্রাহ্মণেরা একধারে বসে মধুর কণ্ঠে বেদ পাঠ করছেন। যজ্ঞে দক্ষিণা দেবার জন্য বহু গাভী আনা হয়েছে। নচিকেতা ঘুরে ঘুরে সব একে একে দেখতে লাগলেন। সব দেখে শুনে তাঁর মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব উদয় হল।

যজ্ঞে সকল দানের চেয়ে গাভীদান শ্রেষ্ঠ। উদ্দালক ছিলেন বড় কৃপণ ও হিসেবী। দান করবার জন্য তিনি বেছে বেছে যত বুড়ো গরু সব এনেছিলেন। নচিকেতা যখন গরুগুলোর কাছে গিয়ে দেখতে লাগলেন, সেগুলোর চেহারা দেখে তাঁর মনে ভারি দুঃখ হল। তিনি ভাবলেন, জন্মের মত যাদের বাচ্চা দেওয়া শেষ হয়েছে, দুধ দেওয়া শেষ হয়েছে, ঘাস খাওয়া শেষ হয়েছে, অল্প দিনের মধ্যেই যারা মরে যাবে, এমন সব বুড়ো বুড়ো গরু দান করে বাবা আমার পুণ্যের চেয়ে পাপই লাভ করবেন বেশী। কিন্তু তাঁর যা স্বভাব, এগুলোর পরিবর্তন করা আর সম্ভব নয়। তবে আমার কর্তব্য আমি করি। বাবা তাঁর অনেক সম্পত্তি দান করছেন। আমিও তো তাঁর একটি সম্পত্তি, আমাকেও তাঁর কারু কাছে দান করা উচিত।

উদ্দালক তখন যজ্ঞে মহাব্যস্ত ছিলেন। নচিকেতা গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আমাকে কার নিকট দান করবেন?

উদ্দালক বললেন, যা, এখন গোলমাল করিস নি।

নচিকেতা চলে গেলেন। কিন্তু পিতার দানের কথা তাঁর বারবারই মনে হতে লাগল। আবার গিয়ে তিনি বাবাকে বললেন, বাবা, আমায় কাকে দান করবেন?

উদ্দালক উত্তর করলেন, তুই তো ভারি দুষ্ট দেখছি। যা এখান থেকে।

নচিকেতা চলে গেলেন।

চারিদিকে মহাধুমধাম চলছে। নচিকেতার মনে কিন্তু শান্তি নেই। তিনি কেবলই ভাবছিলেন, কি দানই বাবা আমার করছেন। যদি তিনি আমার উপর রাগ করেন সেও ভাল, তবুও উচিত আমাকেও তাঁর দান করা।

আবার সাহসে ভর করে নচিকেতা বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, আমাকে কার নিকট দান করবেন ?

ছেলের কাণ্ড দেখে উদ্দালক গেলেন ভয়ানক রেগে। বার বার তিনবার এসে জ্বালাতন করাতে তিনি রেগে বলে উঠলেন, নচিকেতা, তোমায় আমি যমকে দান করলুম।

বাবা রাগ করেছেন দেখে নচিকেতা আর কথাটি না বলে ধীরে ধীরে অন্যদিকে চলে গেলেন। নচিকেতার মনে বিশ্বাস ছিল, তিনি একজন ভাল ছেলে। বাবার কথা শুনে তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন, আমি হয়তো অনেকের মধ্যে মধ্যম, আবার অনেকের মধ্যে নিশ্চয়ই উত্তম, কিন্তু আমি সকলের চেয়ে অধম—একথা কখনও হতে পারে না।

বাবা আমাকে যমের নিকট দান করলেন। আমার এখন কি কর্তব্য? বাবার আদেশ পালন না করা আমার মত ছেলের সাজে না। কাজেই আমাকে যমের বাড়ি যেতেই হবে। বাবার কথা আমায় রাখতেই হবে।

যমের বাড়ি যাওয়া বড় যে-সে কথা নয়। মরবার আগে কেউ যমের বাড়ি যেতে পারে না। অনেক বিচার করে নচিকেতা যমের বাড়ি যাত্রা করলেন। তিনি মৃত্যুকে বরণ করেই যমালয়ে গিয়েছিলেন কি অন্য ভাবে গিয়েছিলেন, সে কথা জানতে পারা যায় না। যে ভাবেই হক তিনি যমের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন। অবশ্য একথা ঠিক, খুব আরাম করে তিনি যমের বাড়ি যেতে পারেন নি, তাঁকে মহাদুঃখ ভোগ করেই সেখানে যেতে হয়েছিল।

যমরাজা সমস্ত জগতের মৃত্যুর রাজা। সকলের শেষ বিচার যমরাজার হাতে। সংসারে মানুষ যে-কাজ করে, এমনকি যে-চিন্তাটি করে, সেটি তখনই যমরাজার বাড়ি লেখা হয়ে যায়। মানুষ মরলে যমদূতরা তাকে যমরাজের কাছে নিয়ে হাজির করে। তখন চিত্রগুপ্তের ডাক পড়ে। চিত্রগুপ্ত যমরাজের একজন কর্মচারী। তিনি তাঁর বিশাল খাতা নিয়ে দরবারে হাজির হন। তারপর খাতা খুলে লোকটার পাপ পুণ্যের হিসাব বলে দেন। যমরাজের আদেশে পুণ্যাত্মারা স্বর্গে যান আর পাপীরা যায় নরকে। স্বর্গে যেমন সুখ, নরকে তেমনি দুঃখ।

নচিকেতা যমের বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। মস্ত বড় রাজবাড়ি, কত দাস দাসী চর অনুচর। যমের লোকেরা দেখলে,

কে এক ব্রাহ্মণ-বালক দুয়ারে দাঁড়িয়ে, যেন প্রভাতী সূর্য পুব আকাশ ছেড়ে যমের বাড়ি এসে উদয় হয়েছে। নচিকেতার তেজোময় চেহারা দেখে ভয়ে কেউ এগুতে পারলে না। এ বলে তুই যা, ও বলে তুই যা। সাহসে ভর করে শেষকালে একজন নচিকেতার সামনে এল। নচিকেতা বললেন, আমি যমরাজার কাছে এসেছি, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল।

যোড়হাতে যমদূত বললে, তিনি একটি বিশেষ কাজে অন্যত্র গেছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নেই। আপনি দয়া করে ভিতরে আসুন। আমরা আপনার থাকবার খাবার সব ব্যবস্থা করে দেব।

নচিকেতা উত্তর করলেন, না বাপু সে হয় না। কর্তা যখন বাড়ি নেই, তখন আমার সেখানে গিয়ে বাস করা বা কিছু খাওয়া ঠিক হবে না।

যমদূত অনেক অনুরোধ অনুনয় করলে, কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই ভিতরে যেতে বা কিছু খেতে রাজি হলেন না। বাইরেই তিনি বসে রইলেন। একটি দিন কেটে গেল, যমরাজ বাড়ি ফিরলেন না। দ্বিতীয় দিনও গেল, তৃতীয় দিনও গেল, তবুও যমরাজের দেখা নেই। তিন দিন পর তিনি বাড়ি ফিরলেন।

যমকে বাড়ি ফিরতে দেখে যমদূতরা ব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে দৌড়ে গেল আর যোড়হাতে বললে, মহারাজ, প্রভাতী সূর্যের মত তেজোময় এক ব্রাহ্মণ-বালক আজ চারদিন আমাদের
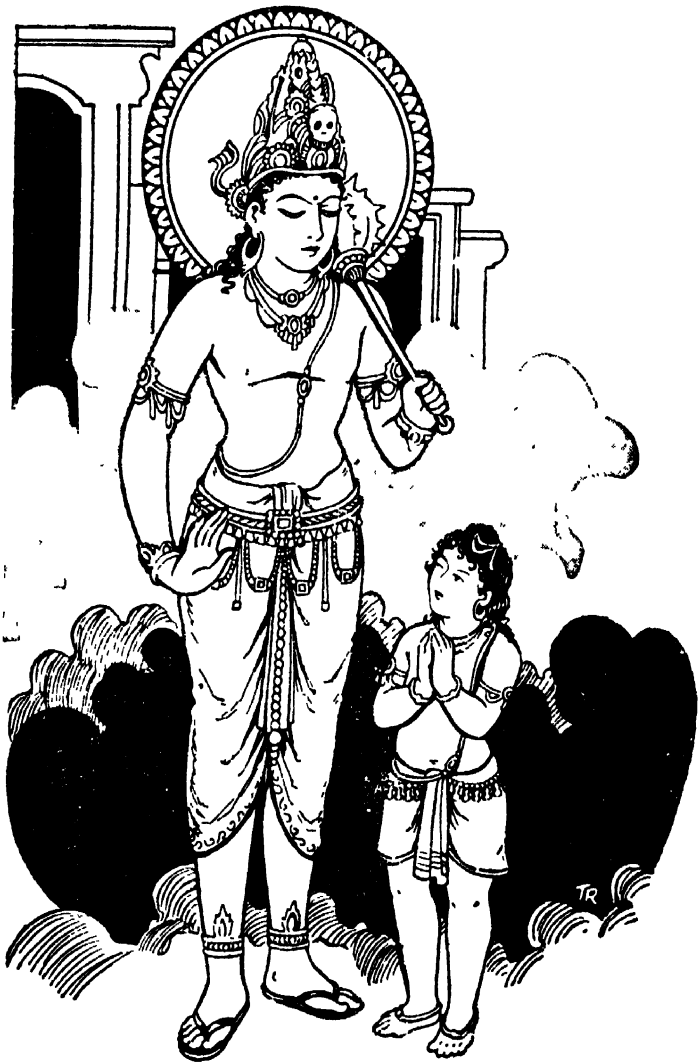
যম ও নচিকেতা

এখানে এসেছেন, আমরা তাঁকে কত অনুরোধ করেছি, কত বলেছি, কিছুতেই তিনি ভিতরে এলেন না বা কিছু খেলেন না। তিনদিন ধরে সেখানেই বসে আছেন। এক ফোঁটা জলও মুখে দেন নি। তিনি বলেন, কর্তা যখন বাড়ি নেই, তখন বাড়িতে গিয়ে বাস বা আহার করা উচিত নয়।

এই কথায় যম তাড়াতাড়ি পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে নচিকেতার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, কে তুমি অতিথি ব্রাহ্মণ-বালক? আমি বাড়ি ছিলুম না। তুমি এসে তিনদিন উপবাসে অনাহারে বাইরে কাটিয়েছ। অতিথির অনাদর হলে মহাপাপ হয়। অতিথি দেবতা, তুমি সন্তুষ্ট মনে এ পাদ্য গ্রহণ কর, এ অর্ঘ্য গ্রহণ কর।

নচিকেতা যমকে নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিলেন, যমালয়ে আসবার কাহিনী বললেন, তারপর পাদ্য অর্ঘ্য গ্রহণ করে যমের সঙ্গে বাড়ির ভিতর গমন করলেন। নচিকেতার তেজোময় রূপ ও সরল মিষ্ট কথা শুনে যম বড় খুশী হলেন। যম বললেন, বাছা, তুমি একে ব্রাহ্মণ-সন্তান, তাতে আবার অতিথি। আমার ঘরে এসে তুমি কত কষ্টই না পেয়েছ! তুমি আমার জন্য তিন দিন অনাহারে অপেক্ষা করেছ, তার জন্য আমি তোমাকে তিনটি বর দেব। তোমার যেমন ইচ্ছা তিনটি বর আমার কাছে চাও।

নচিকেতা বললেন, যমরাজ, যখন আপনি দয়া করে আমাকে তিনটি বর চাইতে বলছেন, নিশ্চয়ই আমি বর চাইব।

আমার বাবা আমার উপর রাগ করে আপনার নিকট আমাকে দান করে দিয়েছেন। তাঁর রাগ গিয়ে যেন মন শান্ত হয়। আমি যখন আপনার কাছ থেকে ফিরে যাব, তখন যেন তিনি আমাকে চিনতে পারেন ও আগের মতই আমাকে আদর করেন। তিন বরের মধ্যে আমি এই প্রথম বর চাইছি।

যম বললেন, তথাস্তু। তুমি দ্বিতীয় বর চাও।

নচিকেতা বললেন, শুনেছি, স্বর্গে ভয় বলে কোন বস্তু নেই। সেখানে আপনিও যেতে পারেন না। সেখানকার অধিবাসীদের রোগ নেই শোক নেই দুঃখ নেই ক্ষুধা নেই তৃষ্ণা নেই। সেখানকার লোকেরা কখনও বুড়ো হয় না। যে যজ্ঞ করলে স্বর্গে যাওয়া যায়, আপনি আমাকে দয়া করে তার কথা বলুন। এইটি আমার দ্বিতীয় বর।

যম তখন সে যজ্ঞের কথা, কি-ভাবে অগ্নি স্থাপন করতে হয়, যজ্ঞ-বেদিতে কখানা ইট কি-ভাবে দিতে হয়, কোন্ মন্ত্রে অগ্নির উপাসনা করতে হয়, সমস্ত কথা নচিকেতাকে বললেন। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি যত কথা বলেছি, তোমার কি সব মনে থাকবে? বল দেখি, আমি যা যা বলেছি।

নচিকেতার মনের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি অতি সুন্দরভাবে যমের সমস্ত কথা বলে গেলেন। শুনে যম তো অবাক। তিনি বললেন, আমি বড় আনন্দিত হলুম। এ কঠিন বিষয়টি তুমি আগাগোড়া মনে রেখেছ আর ঠিক ঠিক ভাবে আমার কাছে আবার বলতে

পেরেছ। তার পুরস্কার স্বরূপ আজ থেকে তোমারই নামে এ অগ্নির নাম হবে নাচিকেত অগ্নি। তুমি তৃতীয় বর চাও।

নচিকেতা বয়সে বালক হলেও তাঁর অন্তরটা ছিল জ্ঞানীর মত। মাঝে মাঝে সংসারে এমন এক একজন মহাপুরুষ আসেন, যাঁরা অতি অল্প বয়সেই এত জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় দেন, যা সাধারণ মানুষ বুড়ো বয়সেও পারে না।

তৃতীয় বরে নচিকেতা বললেন, কেউ কেউ বলেন মরবার পরও মানুষ থাকে, আবার কেউ কেউ বলেন মরবার পর কিছু থাকে না। মরবার পর মানুষের আত্মা থাকে, না নষ্ট হয়ে যায়, এই আত্মবিদ্যা আপনি আমাকে শিক্ষা দিন। এটিই আমার তৃতীয় বর।

আত্মবিদ্যা শেখবার সত্যিকার ইচ্ছা নচিকেতার মনে হয়েছে কিনা আর তা লাভ করবার শক্তি আছে কি না, দেখবার জন্য যম নচিকেতাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন।

যম বললেন, বাবা, তুমি যে প্রশ্নটি করেছ, তা বড় কঠিন। দেবতার মনেও এ প্রশ্ন জাগে। তুমি কেন এ কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছ? তুমি অন্য বর চাও। যেমন, দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে, বহু ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি লাভ করবে, বহু ধন জন রাজ্য রাজত্ব হাতি ঘোড়া রথ তোমার হবে, এরূপ বর আমার কাছে চাও। এগুলোকেই মানুষ সুখের চরম বলে মনে করে। এর মধ্যে যত ইচ্ছা তুমি আমার কাছে চাও। আমার কথা শোন বাবা, মৃত্যুর কথা জিজ্ঞেস করো না।

সংসারের নিয়মই এই, কোন বড় কাজ করতে গেলেই তাতে অনেক বাধা বিপদ আসে, পদে পদে কত প্রলোভন আসে। যাঁদের মনকে এসব বাধা বিপদ থামাতে পারে না, প্রলোভন মোহিত করতে পারে না, তাঁরাই শেষকালে জয়-লাভ করেন, তাঁরাই জগতে খ্যাতিলাভ করেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁদের নামই চিরকালের মত সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে যায়।

নচিকেতার তখন বাস্তবিকই একটা মহা বিপদ উপস্থিত হল। একদিকে সংসারের চরম সুখ আর অন্যদিকে আত্মজ্ঞান। নচিকেতা কি চাইবেন? ধীরে ধীরে তিনি উত্তর করলেন, আমি জানি যমরাজ, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে যে কোন সময় সমস্ত পৃথিবীর ধন জন মণিমুক্তা রাজ্য সিংহাসন সবই দিতে পারেন, আর যতদিন আপনি আছেন ততদিন আমারও মরণ হবে না। কিন্তু তারপর? আজ হক আর দুশ বা দুলক্ষ বছর পরেই হক, সংসারের এসব সুখ চলে যাবেই। তারপর কি হবে? আমি এগুলো চাই নে। যখন দেবতাদের মনেও আত্মার বিষয় প্রশ্ন হয়, তখন আপনার মত গুরু আমি আর কোথা পাব? আপনি মৃত্যুর রাজা, মৃত্যুর কথা আমাকে বলুন। ইহাই আমার তৃতীয় বর।

যম তখন আবার নানাভাবে সংসারের নানা সুখের কথা বলতে লাগলেন। কিন্তু নচিকেতা সে-সব কিছুই চাইলেন না। শেষে বহু পরীক্ষার পর যম নচিকেতাকে আত্মবিদ্যা শিক্ষা দিলেন।

নচিকেতার কাহিনীতে আমরা যে শুধু আত্মজ্ঞানের শিক্ষা পাই, তা নয়, আর একটা মস্ত বড় কথাও আমরা নচিকেতার নিকট থেকে শিখতে পারি। বলহীন সাহসহীন আত্মবিশ্বাসহীন কাপুরুষের কোথাও স্থান নেই। ভয়ই মানুষকে শক্তিহীন করে, কাপুরুষ করে। মরবার ভয় আবার সকল ভয়ের চেয়ে বড়। মৃত্যুভয় যার নেই, জগতে ভয় বলে কোন বস্তুই তার নেই। আমাদেরই পূর্বপুরুষ নচিকেতা তাঁর বালক বয়সেই কেমন নির্ভিকভাবে মৃত্যুকে বরণ করলেন, মৃত্যুর দেবতা যমরাজকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে দুর্লভ আত্মজ্ঞান উদ্ধার করে আনলেন।

সংসারে কেউ অমর নয়, সকলেই মরে। একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যাঁরা নিজের ইচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন, তাঁরাই কেবল অমর হন।

ছোট থেকে বড়

ভগবানের জন্য সাধনা করতে হলে অথবা সংসারে উন্নতি করতে হলে একদিনেই হয় না। একলাফেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠা যায় না। এক পা এক পা করে উঠলে শেষকালে সেখানে পৌঁছা যায়। সংসারের উন্নতি করতে হলেও সেরূপ খুব চেষ্টা করে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে যেতে হয়। ধর্মসাধনার বেলাও ঠিক তাই। প্রথম ছোট ছোট সাধন থেকে ক্রমে বড় সাধনে এবং শেষকালে ভগবানের কাছে পর্যন্ত পৌঁছা যায়। সাধনার উপদেশ দিতে গিয়ে স্বামিজী এ গল্পটি বলেছিলেন। তাঁর রাজযোগ পুস্তকে এ গল্পটি আছে।

এক রাজা ছিলেন বড় অত্যাচারী। তিনি প্রজাদের উপর বড় অত্যাচার করতেন। নিজের আনন্দ নিজের সুখ সুবিধা হলেই হল, প্রজাদের দিকে তিনি ফিরেও চাইতেন না।

ভারতবর্ষে বহু ভাল রাজা ছিলেন। আজও তাঁদের কথা লোকে মনে করে ও দেবতার মত তাঁদের ভক্তি করে। নিজের ছেলের মতই তাঁরা প্রজাদের ভালবাসতেন। নিজের ছেলের জন্য বাবা যেমন ভাবেন, তাঁর শিক্ষার ও সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেন, রাজারাও প্রজাদের জন্য ঠিক সেরূপ করতেন। রাজাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও মনে করতেন, তিনি যেন প্রজাদের সেবক। বিশাল মানব-সমাজের সেবার ভার ভগবান তাঁর উপর দিয়েছেন। আবার সকল মানুষের মধ্যেই ভগবান বাস করেন। কাজেই প্রজাদের সেবা করলে সেই ভগবানেরই সেবা করা হয়।

কেউ কেউ আবার এমনও মনে করতেন, রাজ্য রাজধানী রাজবাড়ি সকলই প্রজাদের। রাজকোষ প্রজাদেরই ধন-ভাণ্ডার। প্রজাদের সেবকরূপে রাজা সেগুলো রক্ষা করতেন এবং প্রজাদের উন্নতির জন্য ব্যয় করতেন। নিজের সুখের ও আনন্দের জন্য তিনি রাজভাণ্ডার হতে এক পয়সাও খরচ করতেন না। খাওয়া পরার জন্য যা খরচ হয়, নিজের কার্যের বেতন স্বরূপ তাই শুধু রাজভাণ্ডার হতে গ্রহণ করতেন। রাজা রানী থাকতেন বড় সহজভাবে, একেবারে সাধারণ লোকের মত।

কিন্তু যে রাজার কথা বলছি, তিনি ছিলেন এ সকলের ঠিক বিপরীত। মানুষ যেমন দুধ খাবার জন্য ও চাষ করবার জন্য গরু পোষে, খাবার জন্য ছাগল হাঁস পায়রা পোষে, বাড়ি পাহারা দেবার জন্য কুকুর, ইঁদুর মারবার জন্য বিড়াল পোষে, তিনিও ঠিক সেরূপ কেবল নিজের জন্যই প্রজাদের পালন করতেন। টাকা পয়সা নিজের খেয়াল মত যেখানে সেখানে তিনি খরচ করতেন। রাজকোষ শূন্য হচ্ছে দেখলে প্রজাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে জোর করে তিনি টাকা আদায় করতেন। যখন তখন যার তার মাথা কেটে ফেলতেন, যাকে তাকে বন্দী করে রাখতেন বা পাহাড়ে পর্বতে বাঘের মুখে ছেড়ে দিয়ে দূর থেকে তিনি মজা দেখতেন। কোনরূপ বিচারের বা ন্যায়ের ধার দিয়েও তিনি যেতেন না।

রাজার অত্যাচারে দেশের লোক দিন দিন বিরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু মুখে কিছু বলতে কারু সাহস হত না। কারণ, যে-ই বলতে চেষ্টা করবে তার ভাগ্যেই মহাবিপদ আসবে।

হয়তো তার মাথাটাই কাটা যাবে, অথচ ফল কিছুই হবে না। এজন্য দেশের লোক চুপ করে সব অত্যাচার অবিচার সয়ে যেতে লাগল।

মানুষের অন্তরে মহাশক্তিরূপে ভগবান বাস করছেন। অত্যাচার অবিচার অধর্ম যখন চরমে ওঠে আর মানুষের অন্তর-দেবতাকে গিয়ে তা স্পর্শ করে, তখন মানুষের ভিতরে সেই মহাশক্তির জাগরণ হয়। ঘুমন্ত সাপ যেন ফনা তুলে দাঁড়ায়, কোন অত্যাচার কোন ভয়ই তাকে আর চেপে রাখতে পারে না, রাজ্যে ওঠে বিদ্রোহের তাণ্ডব লীলা।

রাজার অত্যাচারে ক্রমে ক্রমে রাজ্যে দুএকটি স্থানে বিদ্রোহের সূচনা দেখা গেল। রাজা তাঁর সমস্ত শক্তি ও উৎসাহ নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে গেলেন। দোষী নির্দোষী বিচার না করে বহু লোকের মাথা কাটলেন, বহু লোককে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন, অবশিষ্ট গ্রামবাসী ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়ী সকলকে তাঁর সেপাই দিয়ে খুব মার দিলেন।

তারপর মনের আনন্দে ঘরে ফিরে গিয়ে ভাবলেন, খুব বীরের কাজ করে গেছেন, আর কোথাও বিদ্রোহ হবে না।

নদীর জল যখন পাহাড় থেকে সাগরের দিকে ছুটে যায়, পথের কোন বাধাই তাকে আর বেঁধে রাখতে পারে না। কিছুতেই বিদ্রোহ থামল না। অত্যাচার করে রাজা যত থামাতে চান, তত যায় বেড়ে। দেখতে দেখতে সারা দেশময় ছেলে বুড়ো সকলের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল।

দেশের বড়রা সকলেই মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কিন্তু রাজাকে বোঝাবার বা থামাবার সাধ্য কারু নেই। অনেক ভেবে চিন্তে তাঁরা ঠিক করলেন, তাঁদের কজন মন্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে সব বলবেন। যেভাবে দেশে শান্তি ফিরে আসে, মন্ত্রীর সঙ্গে তা পরামর্শ করবেন।

রাজা ছিলেন যেমন খারাপ, তাঁর মন্ত্রী ছিলেন তেমনি বড় ভাল। দেশের লোককে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। প্রজাদের দুঃখের সংবাদ তিনি সবই রাখতেন। কিন্তু কি করে যে তাঁদের রক্ষা করা যায়, মন্ত্রী ভেবে পেতেন না। রাজার স্বভাব যে তাঁর ভাল করেই জানা ছিল।

তবুও সাহসে ভর করে তিনি একদিন রাজাকে বললেন, মহারাজ, যদি দাসের অপরাধ না নেন, তা হলে আপনার কাছে দুএকটি কথা বলতে চাই।

রাজা বললেন, কি বলতে চাও, বল।

মন্ত্রী বললেন, মহারাজ, আপনি এ রাজ্যের মালিক, আপনি আপনার প্রজাদের মা-বাপ। আপনি যা করবেন, তাই হবে।

আপনি প্রজাদের লেখাপড়া শেখাবার কোন ব্যবস্থা করছেন না, রাজ্যে যাতে ধীরে ধীরে ধনবল জনবল বৃদ্ধি পায় সে চেষ্টাও আপনি করছেন না। আজকাল নানাস্থানে প্রজারা আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে, সংবাদ পাই। যদি বিদ্রোহের আগুন ধীরে ধীরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তা হলে যে কি হবে, আমি ভেবে পাই নে।

মন্ত্রীর কথায় রাজা মনে মনে বড় বিরক্ত হলেন। খুব গম্ভীর হয়ে তিনি উত্তর করলেন, মন্ত্রী, আজ যে-কথা তুমি মুখে উচ্চারণ করলে আর দ্বিতীয়বার যেন তোমার মুখে সে কথা না শুনি। প্রজাদের বিদ্রোহে ভয় পাবার লোক আমি নই। দুদিন অপেক্ষা কর। দেখ, রাজ্যের ঘরে ঘরে আমি যদি আগুন না জ্বালাই, মানুষের মাংসে কাক শকুন শেয়াল কুকুরের যদি মহাভোজ না লাগাই, রাজ্যে যদি রক্তের নদী না বয়ে যায়, তাহলে আমার নাম পালটে রেখো। যদি তুমি মন্ত্রী না হয়ে আর কেউ হতে, তাহলে আমার পিপাসিত তরবারি এখনই তোমার রক্ত পান করে শান্তি লাভ করত।

দুই হাতে মন্ত্রী রাজার পা দুখানি জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার প্রাণের জন্য আমি ভাবি নে মহারাজ, দুঃখী প্রজাদের আকুল ক্রন্দন আমার অন্তরকে ব্যথিত করে তুলেছে। আপনার পায়ে ধরি মহারাজ, আপনার প্রজাদের মুখের দিকে ফিরে তাকান। তাদের পেটে নেই ভাত, গায়ে নেই কাপড়, মুখে নেই হাসি, প্রাণে নেই শান্তি। আপনি তাদের উপর অত্যাচার করে তাদের দুঃখের বোঝা আর বাড়াবেন না।

তাদের দুঃখের চোখের জল অভিশাপরূপে আমাদের মাথায় এসে পড়বে। এখনও সময় আছে। আপনি যে পথে যাচ্ছেন, সেটি ঠিক পথ নয়, ফিরে আস্থন।

বলতে বলতে মন্ত্রীর দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। কিন্তু তাঁর কথা রাজার অন্তর স্পর্শ করতে পারলে না। মহা বিরক্ত হয়ে রাজা বললেন, উপদেশেরও একটা সীমা আছে মন্ত্রী। কিন্তু তুমি তা ছাড়িয়ে গেছ। কি সাহসে তুমি এসব ধর্মকথা আমার কাছে বলতে এসেছ, আমি তাই ভাবছি। জান মন্ত্রী, ধর্মকথা কবিতা আর রাজনীতি এক নয়? যদি ধর্ম করতে প্রাণ চায়, কবিতায় মেতে উঠে মন, আমার কাজ থেকে অবসর নাও না কেন? আমার কর্তব্য আমি ভাল বুঝি। তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, আর কখনও যেন তোমার মুখে এরূপ ধর্ম-উপদেশ না শুনি।

মহাদুঃখে মন্ত্রী বাড়ি ফিরে গেলেন। মনে মনে বললেন, ভগবান রাজাকে স্থমতি দাও, রাজ্য রক্ষা কর।

একদিন রাজ্যের কজন বাছা বাছা লোক মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবার জন্য মন্ত্রীর বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। খুব আদর যত্ন করে মন্ত্রী তাঁদের বসালেন। তিনি খুব মনোযোগ দিয়ে তাঁদের সব কথা শুনলেন। একে একে তাঁরা রাজার অত্যাচারের কাহিনী, প্রজাদের দুঃখের কথা বলতে লাগলেন। দুঃখে মন্ত্রীর চোখ ছল ছল করে উঠল। তিনি বললেন, আমি সবই জানি। দেশের কথা ভেবে আমার আহার গেছে, নিদ্রা গেছে, কিন্তু ভেবে কোন কূল কিনারা পাই নে। আপনারা

দেশের গণ্যমান্য লোক। আপনারাও ভাবুন। আমাদের সকলের চেষ্টায় হয়তো এমন একটা সন্ধান পাওয়া যাবে, যাতে রাজা প্রজা রাজ্য সকলেরই প্রকৃত মঙ্গল আসবে।

মন্ত্রীর কথায় ও সদয় ব্যবহারে তাঁরা সকলেই একটা তৃপ্তি পেলেন অন্তরে। দেশের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন।

অত্যাচারীর একটা স্বভাব এই, সে কখনও কাউকে বিশ্বাস করে না, নিজের স্ত্রী পুত্রকেও না। রাজার চরেরা ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে সকল খবর এনে রাজার কানে দিত। হাটে মাঠে পথে ঘাটে প্রজাদের ঘরে ঘরে চরেরা ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়। মন্ত্রীর বাড়ি অনেক প্রজা এসে কি মন্ত্রণা করে গেছে, এ খবর রাজার কানে যেতে দেরি হল না।

রাজা একটি দুর্গের মধ্যে মন্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখলেন। দুর্গের মাথায় একখানি ছোট ঘরে মন্ত্রী থাকতেন। কেউ সেখানে যেতে পারত না। দিনরাত দুর্গের দুয়ারে সেপাইরা পাহারা দিত। ধীরে ধীরে সকল খবর মন্ত্রীর স্ত্রীর কানে গিয়ে পৌছল। তিনি ছিলেন মন্ত্রীর মতই বড় ভাল এবং খুব বুদ্ধিমতী। তিনি কেঁদে আকুল হলেন না, স্থিরভাবে ভাবতে লাগলেন, কি করে মন্ত্রীকে উদ্ধার করা যায়।

সন্ধ্যার পর মন্ত্রীর স্ত্রী রোজ দুর্গের পিছন দিকে গিয়ে বসে থাকতেন। তিনি চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতেন আর ভাবতেন, কি করে মন্ত্রীকে উদ্ধার করা যায়। মন্ত্রীর ঘর থেকে দুর্গের দেয়াল সোজাভাবে একেবারে দুর্গের নীচে পর্যন্ত

চলে গেছে। নীচে পাহাড় ও পাথরের স্তূপ। উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে মানুষ একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

ঘর থেকে মন্ত্রী দেখলেন রোজ সন্ধ্যায় কে একজন দুর্গের নীচে এসে বসে থাকে। মন্ত্রী তার স্ত্রীকে চিনতে পারলেন। দুর্গের উপর থেকে মন্ত্রী ভাবতেন, নীচ থেকে ভাবতেন মন্ত্রীর স্ত্রী। পালাবার কোন পথ তাঁরা দেখতে পেতেন না। কিন্তু মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। যাদের বুদ্ধি আছে আর ধৈর্য আছে, তারা সংসারে অসাধ্য সাধন করতে পারে। অনেক ভেবে চিন্তে মন্ত্রী পালাবার এক উপায় খুঁজে পেলেন।

পরদিন সন্ধ্যায় যখন মন্ত্রীর স্ত্রী এসে দুর্গের নীচে বসলেন, অমনি উপর থেকে একখানা পাতা এসে নীচে পড়ল। পাতায় একটি পাথরের নুড়ি বাঁধা। পাতায় লেখা ছিল, আসছে কাল সন্ধ্যায় একটি গোবরে পোকা, একটু মধু, খুব লম্বা একগাছি রেশমের সুতো, একগাছি শক্ত সুতো, একগাছি সরু দড়ি, একগাছি মাঝারি দড়ি আর একগাছি মোটা দড়ি আনবে।

পাতাটি আঁচলে লুকিয়ে মন্ত্রীর স্ত্রী বাড়ি ফিরে গেলেন। এদিকে মন্ত্রী দুর্গে বসে সারাদিন মনে মনে ভাবলেন, পালাব কি না? দুর্গে থেকে লাভই বা কি? পালিয়ে গিয়ে হয়তো হতভাগ্য দেশের কিছু করা যেতে পারে।

অনেক ভেবে বিচার করে মন্ত্রী পালানোই ঠিক করলেন। নিজের প্রাণের জন্য পালাবার লোক মন্ত্রী ছিলেন না। দেশের দুঃখই তাঁর অন্তরকে অস্থির করে তুলেছিল।

পরদিন সন্ধ্যার পর মন্ত্রীর স্ত্রীকে আবার দুর্গের নীচে দেখা গেল। অমনি উপর থেকে কয়েকটি পাতা এসে মন্ত্রীর স্ত্রীর সামনে পড়ল। তাতে লেখা ছিল, বড় দড়ির এক মাথায় মাঝারি দড়ি, তার মাথায় সরু দড়ি, তার মাথায় শক্ত সুতো এবং তার মাথায় রেশমী সুতো বাঁধ। রেশমী সুতোর অন্য মাথা গোব্‌রে পোকার লেজে বেঁধে দাও। পোকার মাথায় এক ফোঁটা মধু মাখিয়ে তাকে আমার দিকে মুখ করে ছেড়ে দাও।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে মন্ত্রীর স্ত্রী একে একে সব কাজ শেষ করলেন। গোব্‌রে পোকা মধুর গন্ধ পেয়ে মনে করলে উপর থেকে গন্ধ আসছে। ধীরে ধীরে পোকা উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করলে। শেষকালে একেবারে মন্ত্রীর হাতের কাছে এসে উপস্থিত হল। মন্ত্রী তার গা থেকে রেশমী সুতোটি ধরে টানতে লাগলেন। তাতে ধীরে ধীরে শক্ত সুতোর মাথাও তাঁর হাতে এসে উপস্থিত হল। তারপর ধীরে ধীরে সরু দড়ি, মাঝারি দড়ি ও মোটা দড়িও মন্ত্রীর হাতে এসে পৌঁছল। দরজার সঙ্গে শক্ত করে মোটা দড়ির মাথাটি তিনি বাঁধলেন, তারপর ধীরে ধীরে দড়ি বেয়ে অতি সহজেই নীচে নেমে এলেন।

স্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রী বনের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেলেন। যেতে যেতে তাঁরা সে রাজ্য ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। কিছুদিন পরই শত্রুর হাতে রাজা প্রাণ দিলেন। সুযোগ বুঝে মন্ত্রী আবার দেশে ফিরে এলেন এবং রাজার শিশুপুত্রকে

সিংহাসনে বসিয়ে রাজ্য চালাতে আরম্ভ করলেন। মন্ত্রীর গুণে দেশে শান্তি ফিরে এল এবং প্রজাদের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

জড় ভরত

স্বামিজী এমেরিকায় রামায়ণ, মহাভারত, প্রহ্লাদ, জড় ভরত প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছেন। সেই সব একত্র করে "মহাপুরুষ-প্রসঙ্গ" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে জড় ভরতের কাহিনী অতি বিস্তারিত ভাবে আছে।

অতি প্রাচীন কালে ভরত ছিলেন এদেশের রাজা। ভরতের নাম থেকেই এদেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে। রাজা ভরত যেমন বীর ছিলেন, তেমনি ছিলেন ধার্মিক।

রাজা ভরত যখন বুড়ো হলেন, তখন তাঁর ছেলেকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি তপস্যার জন্য বনে চলে গেলেন। তিনি হিমালয়ে একটি ছোট নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে নিজের হাতে ঘাস লতা পাতা দিয়ে একটি ছোট কুটির তৈরী করে বাস করতে লাগলেন। রাতদিন ভরত ভগবানের নাম করতেন, বন থেকে ফল মূল এনে খেতেন।

একদিন ভরত নদীতে স্নান করচেন, এমন সময় দেখলেন, কিছু দূরে একটা হরিণ জল পান করছে। ঠিক সে সময় পাহাড়ের মাথায় সিংহের ডাক শুনতে পাওয়া গেল। ভয় পেয়ে হরিণ হঠাৎ এক লাফ দিলে। হরিণটি ছিল মেয়ে হরিণ, আর তার পেটে ছিল বাচ্চা। লাফ দিয়ে একখানা পাথরের উপর পড়ে হরিণ মরে গেল আর তার একটি বাচ্চাও হল। বাচ্চাটি

তখন জলে পড়ে ভরতের সামনে দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। তাই দেখে ভরতের মনে বড় দয়া হল। তিনি খুব যত্ন করে হরিণশিশুটিকে কুটিরে নিয়ে এলেন।

ভরত কচি কচি ঘাস পাতা এনে বাচ্চাকে খাওয়াতেন, কত আদর করতেন আর বাঘ সিংহের ভয়ে সব সময় তাকে নজরে নজরে রাখতেন। ভরতের যত্নে বাচ্চা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে হরিণ ভরতের সারা অন্তরটি দখল করে বসল। একটু সময় হরিণকে না দেখলে ভরত স্থির থাকতে পারতেন না। তাঁর জপ তপ সব গেল।

হরিণ যখন আরো বড় হল, তখন সে একদিন ভরতের কুটির থেকে পালিয়ে বনে চলে গেল, আর ফিরে এল না। ভরত ভেবে আকুল! তিনি নদীতীরে বনে জঙ্গলে অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন, শেষকালে না পেয়ে বিরস মনে কুটিরে ফিরে এলেন। ভরত কেবল হরিণের কথাই ভাবতে লাগলেন, হয়তো বাঘে খেয়ে ফেলেছে, নয়তো পথ হারিয়েছে। ভরত রোজ মনে করতেন, আজ হয়তো হরিণ ফিরে আসবে। দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস গেল, তবুও হরিণ ফিরে এল না। ভরত বসে বসে ভাবতেন, শুধু হরিণের কথাই ভাবতেন।

কিছুদিন পর ভরত মারা গেলেন। মরবার সময়ও তিনি হরিণের কথাই ভাবছিলেন। তার ফলে তাঁকে হরিণ হয়ে জন্ম নিতে হল। শোনা যায়, পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এমন দু একজন লোক জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁরা তাঁদের পূর্বজন্মের কথা মনে করতে পারেন। তাঁদের নাম জাতিস্মর। হরিণ হলেও ভরত

জাতিস্মর হলেন। পূর্বজন্মের কথা তাঁর সবই মনে ছিল। তিনি বুঝতে পারলেন, ভগবানকে ছেড়ে হরিণের চিন্তা করা তাঁর ভাল হয় নি। তার জন্যই তাঁকে হরিণ হতে হল। তিনি অন্যান্য হরিণদের মত বনে যেতেন না, মুনি ঋষিদের আশ্রমের আশে পাশে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁদের যাগ যজ্ঞ দেখতেন, তাঁদের বেদপাঠ ধর্মকথা সব শুনতেন।

কিছুদিন পর হরিণ-ভরতও মারা গেলেন। তখন তাঁর জন্ম হল এক ব্রাহ্মণের ঘরে। সেবারও তিনি জাতিস্মর হলেন। কিন্তু ভরত খুব সাবধান। তিনি ভাবলেন, কিছুতেই তিনি আর কারু মায়ায়, কারু ভালবাসায় আবদ্ধ হবেন না।

ধীরে ধীরে ভরত বড় হতে লাগলেন। তাঁর শরীর বেশ সবল ও মোটা সোটা ছিল। তিনি কারু সঙ্গে কথা বলতেন না, যেখানে বসতেন সেখানেই বসে থাকতেন। জন্মের পর কেউ তাকে একদিনও কিছু বলতে, কিছু চাইতে বা আনন্দ করতে দেখে নি। সকলেই মনে করত তিনি বোবা আর তাঁর মাথা খারাপ। সারাদিন এক জায়গায় চুপচাপ বসে থাকতেন বলে তাঁর নাম হল জড় ভরত।

কিছুদিন পর ভরতের বাবা মারা গেলেন। ভাইয়েরা বিষয় সম্পত্তি সব ভাগ করে নিলেন। ভরতকে তাঁরা কিছুই দিলেন না। তবে, দয়া করে তাঁরা ভরতকে দুটি দুটি খেতে দিতেন।

ভরত কখনও কোন কাজ করতেন না। তবে অন্য কেউ যদি কোন কাজে তাঁকে লাগিয়ে দিত, তাহলে তিনি তা করেই

যেতেন। যখন এসে আবার তারা বলত, থাম, আর দরকার নেই, তখন থামতেন। ভাইয়েরা মাঝে মাঝে তাঁকে নিয়ে ক্ষেতের কাজে লাগিয়ে দিতেন। বউয়েরা কিন্তু তাঁকে বাড়িতে বড় যন্ত্রণা দিতেন। তিনি কিছুই বলতেন না, চুপ করে থাকতেন।

বউএরা তাঁকে এত যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করলেন যে তিনি সহ্য করতে না পেরে একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিছু দূর গিয়ে তিনি এক গাছতলায় বসে রইলেন। ঠিক সে সময় রাজা রহুগণ পাল্কি চড়ে যাচ্ছিলেন। পথে তাঁর এক বাহকের হঠাৎ কি অসুখ করলে। তখন পাল্কি-বাহকের জন্য তাঁর লোকেরা গিয়ে বেশ সুস্থ সবল দেখে ভরতকে ধরে আনলে। অন্যান্য বাহকদের সাথে ভরতও পাল্কি কাঁধে চলতে লাগলেন।

ভরত জীবনে কখনও এরূপ কাজ করেন নি। তাই অন্যান্য বাহকদের মত তিনি চলতে পারলে না। তাতে পাল্কি বড় নড়তে লাগল। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, পাল্কি এত নড়ে কেন?

বাহকেরা বললে, মহারাজ. নূতন লোকটা আমাদের সঙ্গে সমানভাবে চলতে পারছে না, তাই পাল্কি নড়ছে।

সুস্থ সবল শরীর অথচ ভরত ঠিক ঠিক চলতে পারছেন না দেখে রাজা তাঁকে নানারূপ ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগলেন। ভরত চুপ করে চলতে লাগলেন। পাল্কি আগের মতই নড়তে লাগল। তখন রাজা বিষম চটে গিয়ে ভরতকে যা-তা বলে গালাগালি দিতে লাগলেন।

তখন ভরত কথা বলতে আরম্ভ করলেন। জীবনে এই তিনি প্রথম কথা বললেন। রাজার ঠাট্টা বিদ্রূপ ও গালাগালের
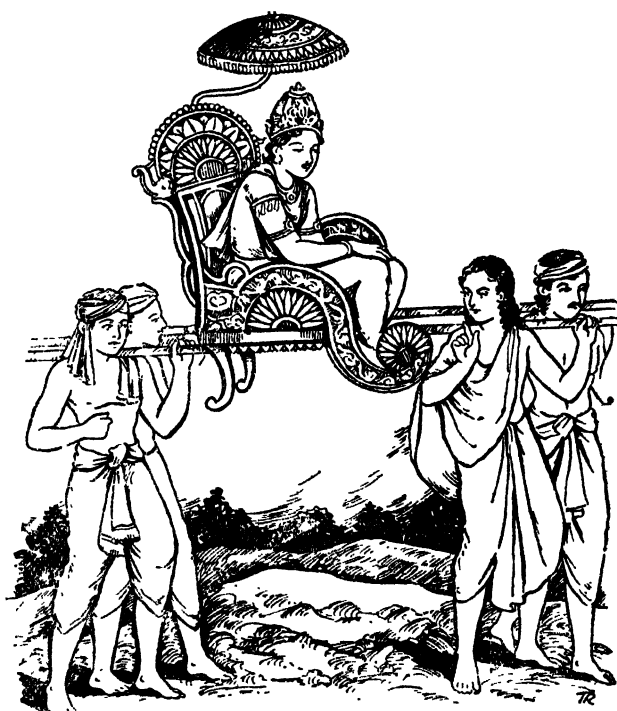
উত্তরে ভরত এমন সব জ্ঞানেরকথা বলতে আরম্ভ করলেন, যা শুনে রাজা একেবারে অবাক হয়ে গেলেন। রাজাও বেশ পণ্ডিত ছিলেন এবং অনেক শাস্ত্র পড়েছিলেন। ভরতের কথা

শুনে তিনি বুঝতে পারলেন, ইনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ, ছদ্মবেশে সংসারে বাস করছেন।

রাজা তাড়াতাড়ি পাল্কি থেকে নেমে এসে ভরতকে প্রণাম করলেন, তাঁর পায় ধরে ক্ষমা চাইলেন আর তাঁর মুখে ধর্মকথা শুনতে চাইলেন। ভরত তাঁকে অনেক জ্ঞানের কথা বলেছিলেন।

রাজা তাঁর কাছে বিদায় নিলেন। ভরত আগের মতই চলতে লাগলেন। কিছুদিন পর তাঁর মৃত্যু হল। এবার তিনি জ্ঞানলাভ করেছিলেন, তাই আর তাঁর জন্ম হল না। তিনি মুক্ত হয়ে গেলেন বা ঈশ্বর লাভ করলেন।

খোদার দরবার

এ গল্পটি রামকৃষ্ণদেব বলতেন। স্বামিজী তাঁর ভক্তিরহস্য পুস্তকে একটু পরিবর্তন করে এ গল্পটি বলেছেন।

জালাল ফকিরের মাঠ। মাঠ নয় যেন তেপান্তরের মাঠ! তেপান্তরের মাঠ কেউ দেখে নি। কিন্তু জালাল ফকিরের মাঠে একবার যারা গেছে, তারাই সে মাঠের নামে ভয় পায়। চারদিকে যতদূর দু চোখ যায়, কেবল ধূ ধূ মাঠ, কোথাও বাড়িঘর লোকজনের চিহ্ন মাত্র নেই। পাঞ্জাব থেকে দিল্লি যেতে হলে সকল পথিককেই এই জালাল ফকিরের মাঠটি পেরিয়ে যেতে হয়। দুপুর বেলা সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর ওঠে, সারা মাঠে কে যেন আগুন ছড়িয়ে দেয়। গরমে জলতেষ্টায় অসহায় পথিক মাঠের মাঝে প্রাণ দেয়।

মাঠের ঠিক মাঝখানে জালাল সাহেব ফকিরের একটি ছোট্ট কুঁড়ে। কবে কত কাল থেকে ফকির সাহেব এখানে এসে বাস করছেন, তা কেউ জানে না। দেশে দেশে ফকিরের খুব নাম। অশিক্ষিত লোকেরা বলাবলি করে, খোদার সঙ্গে ফকির সাহেবের কথা হয়, একটা শের নাকি ফকির সাহেবের দরগা রাতদিন পাহারা দেয়। আরো কত আজগুবি কথা।

যাহোক, ফকির সাহেব সত্যিই বড় ভাল মানুষ ছিলেন আর তাঁর নাম থেকেই সেই মাঠের নাম হয় জালাল ফকিরের মাঠ। যে সময়ের কথা বলছি, তার ত্রিশ বছর আগেও সেখানে এরূপ রাক্ষুসে মাঠ ছিল না। ছিল শহর নগর জনপদ। কত ধনী মানী গুণী লোকের বাস ছিল, কত বাগ বাগিচা কত ইমারত কত কি ছিল এখন তার চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না। মুসলমান বাদশাহের বার বার আক্রমণে এসব সোনারপুরী এখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

দিল্লির পথে কত পথিক যায়, কত সওদাগর চলে আর তাদের বহুলোক জালাল ফকিরের মাঠে প্রাণ দেয়। বছর বছর কত লোক যে এভাবে মারা যায়, তা বলা যায় না। মানুষের দুঃখ দেখে জালাল সাহেবের প্রাণে বড় দয়া হত, কিন্তু ভেবে কোন উপায় তিনি ঠিক করতে পারতেন না।

অনেক ভেবে চিন্তে ফকির সাহেব ঠিক করলেন, মাঠের মাঝে মাঝে সরাই বা মুসাফিরখানা তৈরী করে দিতে হবে, প্রত্যেক সরাইতে কুয়ো খুঁড়ে দিতে হবে, অসহায় পথিকদের জন্য কিছু কিছু খাবার রাখতে হবে, তাহলে পথিকদের আর কোন দুঃখ থাকবে না আর এভাবে মাঠের মাঝে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাদের প্রাণও যাবে না। ফকির সাহেব তো অনেক ভেবে চিন্তে এসব ঠিক করলেন। কিন্তু এসব করে কে? অনেক টাকার দরকার যে। ফকির সাহেব সন্ন্যাসী মানুষ। এত টাকা পয়সা তিনি পাবেন কোথায়?

যাঁরা ভগবানকে পাবার জন্য নিজের আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করে দূরে চলে যায় তাঁরাই ফকির, তাঁরাই সন্ন্যাসী। আপনার লোকের দুঃখ কষ্ট তাঁদের মনকে বিচলিত করতে না পারলেও বিশ্ববাসীর দুঃখে তাঁদের প্রাণ কেঁদে ওঠে।

কুটিরের সামনে বসে ফকির সাহেব রোজ পথিকদের দুঃখের কথা ভাবতেন, মুসাফিরখানার কথা চিন্তা করতেন।

কিছুদিন পর, একদিন একদল লোক দিল্লি থেকে ফিরে আসছিল। তাদের মুখে ফকির সাহেব শুনতে পেলেন, দিল্লির বাদসা নাকি একটা নূতন রাজ্য জয় করেছেন আর সেখানে

থেকে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসেছেন। গরিব দুঃখীদের মধ্যে কিছু কিছু ধনও নাকি বাদশা দান করছেন।

এ সংবাদ শুনে ফকির ভাবলেন, যদি বাদশা ইচ্ছা করেন তবে এ কাজটা অতি সহজেই হয়ে যায় আর শত শত অসহায় পথিকের একটা মস্ত উপকারও হয়। এই ভেবে ফকির সাহেব একদিন দিল্লির পথে যাত্রা করলেন। মানুষের দুঃখ তাঁর অন্তরে গিয়ে বড় আঘাত করেছিল। তাই ফকির নিজেই বাদশার কাছে যাত্রা করলেন টাকা ভিক্ষে করে আনবার জন্য।

ফকিরের অনেক বয়স হয়েছিল। তিনি ভাল চলতে পারতেন না, যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়তেন, একটু পরে আবার চলতেন। এভাবে চলতে চলতে বহুদিন পর তিনি দিল্লির দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

বয়সে রূপ নেই, রঙে রূপ নেই, শরীরে রূপ নেই। যথার্থ রূপ যথার্থ সৌন্দর্য আছে পবিত্রতায়, যথার্থ রূপ আছে প্রেমে। পবিত্রতার আগুন যাঁর অন্তরে জ্বলছে, তার তেজ ফুটে ওঠে তাঁর চেহারার মধ্যে আর সে-মুখের রূপ দেখে বিশ্বের লোকের চোখে ধাঁধা লেগে যায়। পরের জন্য যাঁর প্রাণ কাঁদে, অন্যের দুঃখে যাঁর চোখে আসে জল, সেই প্রেমিকের চোখের দিকে যে চায়, সম্ভ্রমে ভক্তিতে শ্রদ্ধায় তারই মাথা নীচু হয়ে আসে।

বুড়ো ফকিরের চোখে মুখে এমন এক স্বর্গের আভা ফুটে উঠছিল যার তুলনা সংসারের কোন বস্তুর সাথেই চলে না।

ফকিরের তেজোময় চেহারা দেখে দ্বারীরা সম্ভ্রমে দ্বার ছেড়ে দিলে। নির্ভিক অন্তরে ফকির রাজবাড়ির ভিতর প্রবেশ করলেন। ফকির দেখলেন ইমারতের পর ইমারত, কত তার কারুকার্য, কত বাগ বাগিচা, কত ফোয়ারা! চারিদিকেই সেপাই সান্ত্রি, লোক জন হাতীঘোড়া কামান বন্দুক।

যেতে যেতে ফকির সাহেব একেবারে অন্তঃপুরের দরজায় গিয়ে উপস্থিত। অন্তঃপুরের ভেতর সকলে যেতে পারে না। ফকির সাহেবকে দেখে অন্তঃপুরের দ্বারী দুহাত তুলে সেলাম করলে, তারপর অতি বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলে, কি হুকুম জনাব?

—আমি বাদশার সঙ্গে দেখা করতে চাই, ফকির উত্তর করলেন।

দ্বারী বললে, আপনারা খোদার ভালবাসার লোক, আপনাদের কোথাও যেতে মানা নেই। বাদশা এখন নমাজে আছেন, আপনি সোজা চলে যান, ঐ মসজিদ দেখা যাচ্ছে।

ফকির ধীরে ধীরে মসজিদের ভিতর প্রবেশ করে দেখলেন, বাদশা তখনও নমাজ পড়ছেন। তিনি পেছনে চুপ করে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরেই বাদশার নমাজ শেষ হল। তখন তিনি যোড়হাতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, হে খোদা, আমাকে আরো ধন দাও জন দাও রাজ্য দাও রাজত্ব দাও সুখ দাও।—এভাবে অনেকক্ষণ ধরে বাদশা ভগবানের কাছে নানা জিনিস প্রার্থনা করতে লাগলেন।

তখন ফকির ধীরে ধীরে উঠে চলে যেতে আরম্ভ করলেন। বাদশা দেখলেন একজন ফকির এসে বসেছিলেন, আবার ধীরে ধীরে উঠে চলে যাচ্ছেন। বাদশা তখন হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে ফকিরকে যেতে নিষেধ করলেন। ফকির আবার বসলেন। প্রার্থনা শেষ করে বাদশা বললেন, ফকির সাহেব আপনি কেন এসেছেন, আবার কিছু না বলে কেনই বা চলে যাচ্ছেন ?

ফকির উত্তর করলেন, আমি যেখানে থাকি সেখানে মানুষের বড় কষ্ট। তাদের সাহায্যের জন্য টাকা চাইতে বাদশার কাছে এসেছিলুম।

বাদশা। তাহলে আমার কাছে কিছু না চেয়েই চলে যাচ্ছিলেন কেন ?

ফকির। দেখলুম, আপনিও একজন ভিকিরী। নমাজের পর আপনিও খোদার কাছে আরো টাকা আরো ধন জন রাজ্য রাজত্ব চাইলেন। আপনিও টাকার কাঙাল। যদি টাকা চাইতে হয়, ভিকিরীর কাছে চেয়ে কি লাভ ? তাই ভাবছি, আপনার কাছে আর টাকা চাইব না, চাইতে হয়, একেবারে খোদার দরবারেই চাইব।

এই বলে ফকির চলে গেলেন। ফকিরের কথা শুনে বাদশাও বড় আশ্চর্য ও লজ্জিত হলেন।

ফকির সাহেব আবার পথ চলতে আরম্ভ করলেন। বহুদিন পর আবার তিনি নিজের ঘরে ফিরে এলেন। তারপর রাতদিন ফকির ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন,

হে খোদা, তুমি ছুনিয়ার মালিক। ছুনিয়ার লোকের ছুঃখ তুমি যদি দূর না কর, তবে কে করবে? বছর বছর কত লোকে এ মাঠে জলের অভাবে খাবার অভাবে অসহায় ভাবে মারা যায়। এসব দেখে আর সহ্য করা যায় না। হে খোদা, এর একটি ব্যবস্থা কর।

ধীরে ধীরে ফকিরের ইচ্ছার কথা, দিল্লি যাবার কথা, বাদশার কাছ থেকে টাকা না নেবার কথা, মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন একদল ধনী সওদাগর জালাল ফকিরের মাঠ দিয়ে পাঞ্জাবের পথে যাচ্ছিল। সে মাঠের পথে যারাই যেত তারাই ফকির সাহেবের দরগায় গিয়ে তাঁকে সেলাম করে তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে যেত। সওদাগররা ফকির সাহেবের ইচ্ছার কথা আগেই শুনেছিল। তাঁরা এবার গিয়ে ফকির সাহেবকে বললে পীর সাহেব, শুনলুম পথিকদের জন্য আপনি মাঠের মাঝে মাঝে সরাই কুয়ো এসব করতে চাইছেন। যদি আপনার হুকুম হয় তবে আমরা অতি আনন্দের সহিত সমস্ত ব্যবস্থা করি। আপনি টাকা পয়সার জন্য ভাবনা করবেন না। আপনি যেরূপ অনুমতি করবেন, সমস্ত খরচই আমরা আনন্দের সহিত বহন করব।

খুব খুশী মনে ফকির সাহেব সওদাগরদের কথায় রাজি হলেন। অল্প দিনের মধ্যেই জালাল ফকিরের মাঠের স্থানে স্থানে বহু সরাই তৈরী হয়ে গেল। প্রত্যেক সরাইতে কুয়ো খোঁড়া হল, গরিব পথিকদের জন্য সরাইগুলোতে খাবার

রাখার ব্যবস্থা হল। সেদিন থেকে আর একটি পথিকও জালাল ফকিরের মাঠে জল, খাবার বা আশ্রয়ের অভাবে প্রাণ হারায় নি।

ফকিরের মনে তখন কি আনন্দ! ফকির ভাবলেন খোদার দয়াতেই সব হল। মহৎ লোকের প্রাণে যে ইচ্ছা হয়, ভগবান তা পূরণ করে দেন।

বেসুরো গান

ভগবান অন্তর্যামী। মানুষ মনে মনে ভগবানের কাছে যেমন প্রার্থনা করে, ভগবান তা শুনতে পান। যদি কেউ ভগবানকে শোনাবার জন্য গান করে, সে গান শুদ্ধ সুর ও তালে হওয়াই ভাল। যারা গান জানে না, ভগবানের কাছে গান গেয়ে প্রার্থনা করার চেষ্টার চেয়ে তাদের মনে মনে প্রার্থনা করাই ভাল। বেসুরো গান সম্বন্ধে স্বামিজী তাঁর ভাববার কথা নামক পুস্তকে এ গল্পটি লিখেছেন।

বিরাট ঠাকুর মন্দির। ভিতরে ঠাকুর দেবতা আছেন। ঠাকুর দর্শনের জন্য প্রত্যহ শত শত যাত্রী মন্দিরে আসে। মন্দিরের পূজারীর নাম চোবেজী। চোবেজীর বহু গুণ। চোবেজী একজন মস্ত পালোয়ান আবার সেতারে ওস্তাদ। দু-বেলা দু-ঘটি ভাঙ তিনি উদরস্থ করেন।

একদিন বিকালে চোবেজী এক লোটা ভাঙ খেয়ে দালানের এক কোণে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। তখন একটি লোক মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে এল। ঠাকুর দর্শন করে তার মনে বড় ভক্তির উদয় হল। ভক্তিতে গদ গদ হয়ে সে গান ধরলে। গান নয় যেন গাধার চীৎকার!

এদিকে চোবেজীর ভাঙের নেশা বেশ জমে এসেছে। চোবেজী দেখছেন, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হাতে মন্দিরের ঠাকুর এসে চোবেজীকে বলছেন, আয় বেটা, তোকে আমি সারা দুনিয়ার বাদশা করে দিচ্ছি!

ঠাকুরের কথা শুনে চোবেজীর মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এমন সময় উৎসব বাড়িতে রান্নার কড়া মাজার যেমন বিকট শব্দ হয় ঠিক তেমনি একটি শব্দ হঠাৎ চোবেজী শুনতে পেলেন। তার বাদশাগিরি মিলিয়ে গেল, শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম হস্তে ঠাকুরও ধীরে ধীরে চোবেজীর সামনে থেকে মিলিয়ে গেলেন। চোবেজীর নেশা গেল ছুটে।

তার এ দুর্লভ আনন্দের ব্যাঘাতকারী জীবটি কে, দেখবার জন্য চোবেজীর জবাফুলের মত দুটি চোখ চারদিকে খুঁজতে লাগল। চোবেজী দেখতে পেলেন, একটা লোক নাটমন্দিরের একধারে বসে আপন মনে বিভোর হয়ে ঠাকুরকে গান শোনাচ্ছে আর নারদ ভরত হনুমান নায়ক প্রভৃতি সংগীত-ঋষিদের শ্রাদ্ধ করছে। চোবেজী নিজেও ওস্তাদলোক, মানুষটার বেসুরো বেতালা বিকট চীৎকারে তিনি বিষম চটে গেলেন। বড় বড় লাল চোখ দুটি ঘুরিয়ে চোবেজী জিজ্ঞেস করলেন, বলি, বাপুহে, ও বেসুর বেতাল কি চীৎকার করছ?

লোকটি উত্তর করলে, সুর তানের আমার আবশ্যক কি হে? আমি ঠাকুরজীর মন ভিজুচ্ছি।

চোবেজী বললেন, হুঁ, ঠাকুরজী এমনই আহাম্মক কিনা? পাগল তুই, আমাকেই ভিজুতে পারিস নি। ঠাকুর কি আমার চেয়েও বেশী মূর্খ?

কুয়োর ব্যাঙ

শিকাগো ধর্ম-মহাসভায় একদিন এক ঘটনা হয়েছিল। নানাধর্মের বক্তারা উঠে নিজের ধর্মের প্রশংসা এবং অন্যদের নিন্দা করতে আরম্ভ করেছিলেন। তাতে বেশ একটু কথা কাটাকাটি ও গোলমাল আরম্ভ হয়। তখন স্বামিজী উঠে এ গল্পটি বলে-ছিলেন। তাতে দারুণ লজ্জা পেয়ে বক্তারা সব চুপ করে বসে পড়েছিলেন।

সাগর থেকে একটু দূরে একটি কুয়ো ছিল। তাতে বাস করত এক মোটা কালো ব্যাঙ। কুয়োতেই তার জন্ম হয়েছিল আর জন্মের পর থেকে কুয়োতেই তার বাস। একদিনের জন্যও সে কুয়োর বাইরে আসে নি। বাইরের জগৎটা যে কি রকম, তা সে জানত না। তবুও সে নিজেকে সবজান্তা বলেই মনে করত। শুধু মনে করত নয়, প্রাণের সহিত সে তা বিশ্বাস করত।

কুয়োর জলের সব পোকা আর ছোট ছোট মাছ ধরে সে খেত। সে যখন লম্ফ ঝম্ফ করে জলের উপর সাঁতার কেটে বেড়াত, তার হাব ভাব দেখে মনে হত, সে এক জন কম নয়। উপর থেকে মাঝে মাঝে যে সব পোকা মাকড় কুয়োয় পড়ত সেগুলোও সে ধরে ধরে খেত।

একটা সাগরের ব্যাঙ একদিন সাগরের তীরে বেড়াচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে সে কুয়োর কাছে এসে উপস্থিত হল আর হঠাৎ

কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। কুয়োর ব্যাঙ ভাবলে, বুঝি একটা মস্ত বড় শিকার পড়েছে। লাফ দিয়ে যেমনি সে শিকারের উপর পড়ল, দেখে—ওমা, এ যে তারই মত আর একটা ব্যাঙ। ভয়ে সে তিন হাত দূরে লাফিয়ে পড়ল। সম্মান বাঁচাবার জন্য বাইরে সে এরূপ ভান করলে, যেন সে সাগরের ব্যাঙকে গ্রাহ্যই করে নি।

জন্মের পর থেকে কুয়োর ব্যাঙ আর অন্য কোন ব্যাঙ দেখে নি। নূতন ব্যাঙটা তার মত কালো নয়। তার গায়ে আবার নানা রঙ বেরঙ দেখে কুয়োর ব্যাঙ অবাক হয়ে গেল আর বেশ একটুখানি ভয়ও পেল। সাগরের ব্যাঙ কিন্তু চুপ করে মজা দেখতে লাগল।

সাগরের ব্যাঙকে দেখে কুয়োর ব্যাঙ মনে মনে বড় অশান্তি বোধ করতে লাগল। খুব গম্ভীর হয়ে মোটা গলায় সে সাগরের ব্যাঙকে জিজ্ঞেস করলে, বলি বাপু হে, তোমার আগমন হচ্ছে কোত্থেকে ?

—আমার আগমন হচ্ছে সাগর থেকে।

—সাগর থেকে ? সাগর আবার কি বস্তু হে ?

—সাগর জলে জলময়। যেদিকে চাও, শুধু জল আর জল !

—জলে জলময়। তাহলে তোমার সাগরটা কি আমার কুয়োর মত ?

—তুমি কি পাগল নাকি ? কি করে তুমি সাগরের সঙ্গে কুয়োর তুলনা করছ ?

—আহা চট কেন ? তা হলে তোমার সাগর কি এত বড় ?

এই বলে কুয়োর ব্যাঙ এক লাফ দিলে। সাগরের ব্যাঙ উত্তর করলে, তুমি একটা আস্ত মূর্খ, কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করছ। কোথায় সাগর আর কোথায় তোমার কুয়ো!

—আহা চট কেন বাপু? বলই না? তোমার সাগর তাহলে এত বড়?

এই বলে কুয়োর ব্যাঙ আর একটু জোরে লাফ দিলে। মূর্খের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সাগরের ব্যাঙ চুপ করে
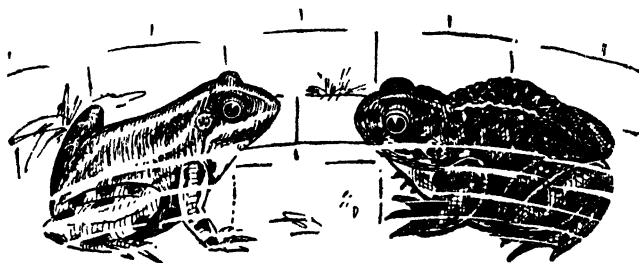
রইল। তখন কুয়োর ব্যাঙ কুয়োর একধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত লাফ দিয়ে বললে, ওগো নতুন দাদা, তোমার সাগরটা কি তা হলে আমার কুয়োর মতই বড়?

—তুমি একটা কালো ভূত, মহা মূর্খ। তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

—আহা চট কেন সাগর-দাদা? বলই না, তোমার সাগরটা কি তাহলে আমার কুয়োর মতই বড়?

—তুমি একটা গাধা। তোমার এ কুয়োর মত কোটি কোটি কুয়ো একত্র করলেও সাগরের এক কোণের সমান হবে না।

—কি ? তোমার সাগর আমার কুয়োর চেয়েও বড় ? তা হতেই পারে না। আমাকে সোজা ভাল মানুষ পেয়ে ঠকাতে এসেছ। তুমি একটা জোচ্চোর। আমার কুয়োর চেয়ে বড় জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু নেই, থাকতে পারে না, একথা আমি ভাল করেই জানি, প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি, তুমি মিথ্যাবাদী, যাও পালাও এখান থেকে।

সাগরের ব্যাঙ বললে, তোমার কুয়োটি ছেড়ে একটু উপরে উঠে এস না ভায়া ? বেশী দূর যেতে হবে না, কাছেই সাগর। সাগর দেখলেই বুঝতে পারবে, আমার কথা সত্যি না মিথ্যে আর তুমি একটা মূর্খ কি না।

—না বাপু, তোমার সাগর দেখে আমার কাজ নেই। আমার এতখানি বয়স হল, জন্ম থেকে একদিনও সাগর দেখলুম না, আর আজ তুমি এসেছ আমাকে সাগর দেখাতে! যাও, যদি ভাল চাও তবে শিগগির পালাও বলছি।

সাগরের ব্যাঙ দেখলে, মূর্খের সঙ্গে কথা বলা বোকামি। ধীরে ধীরে সে কুয়ো থেকে উঠে সাগরের দিকে চলে গেল। কুয়োর ব্যাঙের মনে তখন মহা আনন্দ। সে বলতে লাগল, বাছাধন কার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিলেন। কেমন জব্দ হয়ে গেছেন। সাগর ফাগর কিছুই নেই, সব মিছে কথা। কোথায় থাকে, গায়ে আবার রঙ মেখে আসা হয়েছে। এসে আবার আগড়ম বাগড়ম কত কি বলা হচ্ছে। কেমন জব্দ হয়ে শেষ কালে পালিয়ে গেল। যদি না যেত, তবে একবার বাছাকে দেখে নিতুম।

যারা বলে,—আমার মত, আমার কথা ছাড়া আর সবই মিথ্যা, তারাও কুয়োর ব্যাঙের মতো। নিজের নিজের অজ্ঞান-কুয়োর ভিতর বসে বসে তারা ভাবছে, তাদেরটি ছাড়া জগতে আর ভাল কিছু নেই, বড় কিছু নেই এবং তাদের মতো জ্ঞানী কেউ নেই, বুদ্ধিমানও আর কেউ নেই।
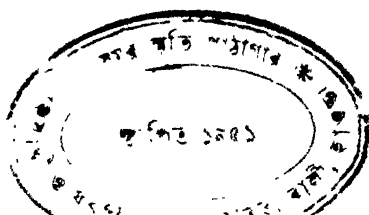
:কয়েকটি অভিমত:

"বিবেকানন্দের কথা ও গল্প" দেশের শিশুচিত্তে আনন্দ ও উৎসাহ দেবে এই আমার বিশ্বাস। **শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**

বইখানি আদ্যপান্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়েছি। বেশ হয়েছে। ছেলে মেয়ে ও তাদের বাপ মা সবাই সমান আনন্দ পাবেন এই গ্রন্থখানি পড়লে। বইখানির যেন বহুল প্রচার হয়, এই কামনা করি। **ডাঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**

......The book is meant for juvenile readers and has been written in an easy, idiomatic, and attractive style. The stories will convey both pleasure and instruction, without any of that didacticism of manner which so often spoils books written for children. It will be good if the author finds time to bring out a number of other books for young readers, containing the teaching of Vivekananda and Ramakrishna through fables and stories, along the lines of the present work.

Dr. H. C. MOOKERJEE
Calcutta University

বইখানি ছেলেদের সুখপাঠ্য, নানা গল্পছলে উপদেশ পরিপূর্ণ। সুন্দর করিয়া কচি পাঠকদের হাতে দেবার মতো একটি জিনিস প্রকাশ করিয়া লেখক এবং প্রকাশক উভয়েই শিশু-সাহিত্যের একটি চমৎকার উপাদান সৃষ্টি করিয়াছেন।

ডাঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"বিবেকানন্দের কথা ও গল্প" পাঠ করিলাম। লেখক ও প্রকাশক শিশুআত্মার পরম উপাদেয় খাদ্য পরিবেশনের ভার লইয়া বাঙালীর জাতীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও কাহিনীসূত্রে কঠোর নীতিকথাগুলি দিয়া মুক্তার মালা রচিত হইয়াছে। এই মালা শিশুর কণ্ঠের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। সুন্দর কাগজ, ছাপা ও উপযুক্ত চিত্রে সজ্জিত হওয়ায় বইখানি অধিকতর মনোরম হইয়াছে। বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে ইহা বিরাজ করিয়া শিশুর মনকে উন্নত ও পরিপুষ্ট করুক, ইহাই প্রার্থনা। **শ্রীমতী মনীষা রায়**, এম. এ.

এসিস্ট্যাণ্ট ইন্‌স্পেকট্রেস অব স্কুলস্
২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনা

:কয়েকটি অভিমত:

"বিবেকানন্দের কথা ও গল্প" পড়িয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালার ছাত্রেরা নিজেদের কর্ম্মজীবন গঠিত করিয়া তুলুক—এই প্রার্থনা করি।

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
ভাইস চ্যান্সেলার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

আমি বইখানি পড়িয়া বস্তুতই অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। বিদ্যাপীঠের প্রকাশিত এই পুস্তকের দ্বারা আমাদের শিশু-সাহিত্যের যে বিশেষ পুষ্টি ও সমৃদ্ধি হইয়াছে তাহাতে আমার কিছুমাত্র সংশয় নাই।

পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্য

সাধারণত নীতিশিক্ষা দেবার জন্য যে সকল বই লেখা হয় এই বইটি সেই শ্রেণীর নয়। বইটি পড়ে আমার বেশ ভাল লেগেছে। এই রকম বই-ই আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত।

শ্রীঅনাথ নাথ বসু
প্রিন্সিপাল, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

শিশুর উপযোগী এইরূপ আখ্যানপুস্তক লেখা মোটেই সহজ নহে। "বিবেকানন্দের কথা ও গল্প" পুস্তকটি এ বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছে বিবেচনা করি। আখ্যানভাগ, ছবি, ছাপা ও অল্প মূল্য সব দিক দিয়াই বইখানি পাঠশালার ছোট ছেলেমেয়েদের হাতে দিবার বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

শ্রীক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
এডুকেশন অফিসার—কলিকাতা কর্পোরেশন

গল্পগুলো বেশ সরলভাবে বলা হয়েছে,—ছেলেমেয়েদের মাথায় বসে যাবে। ইহার ভিতর জীবন গঠনের মসলা আছে ঢের! আপনি শিশু-সাহিত্যের ভিতর একটা নূতন শক্তি আমদানি করলেন।

ডাঃ বিনয়কুমার সরকার

বইখানি আদ্যন্ত পড়িয়াছি এবং পড়িয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। বইখানি ছেলেমেয়েদের প্রিয় হইবে এবং তাহাদের মানসিক ও আত্মিক উন্নতির পথে সহায়ক হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়